জানুয়ারি ২০২৫ ■ পৌষ-মাঘ ১৪৩১

নবারুণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

শিশুর ভাবনায় বই

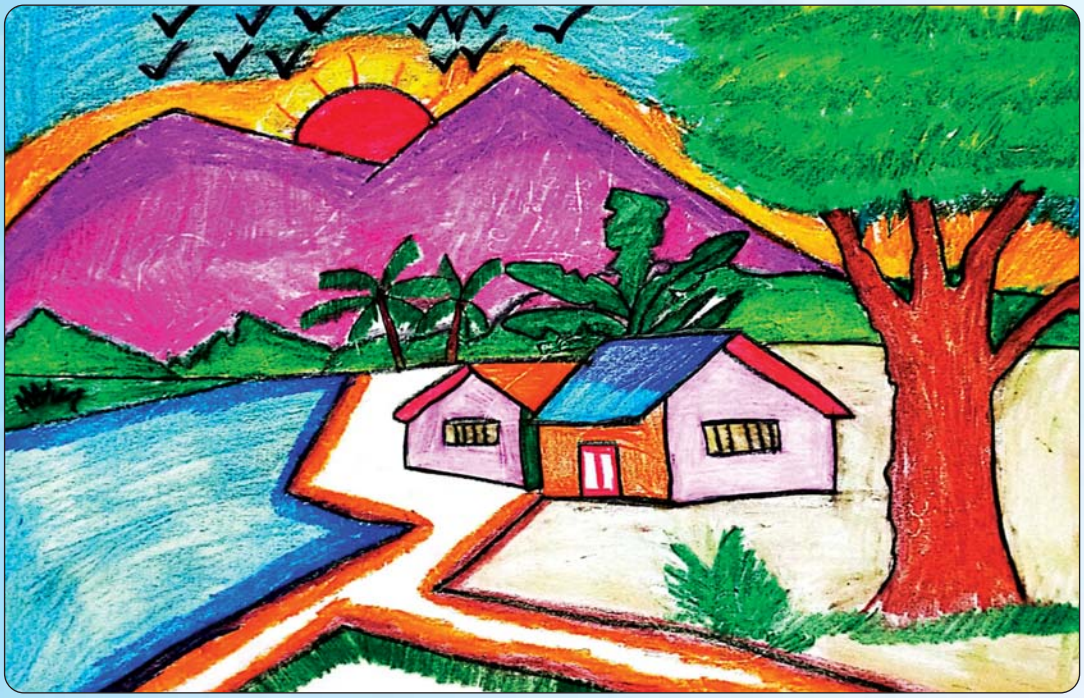

সারা সানজিদা, চতুর্থ শ্রেণি, রায়ের বাজার উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

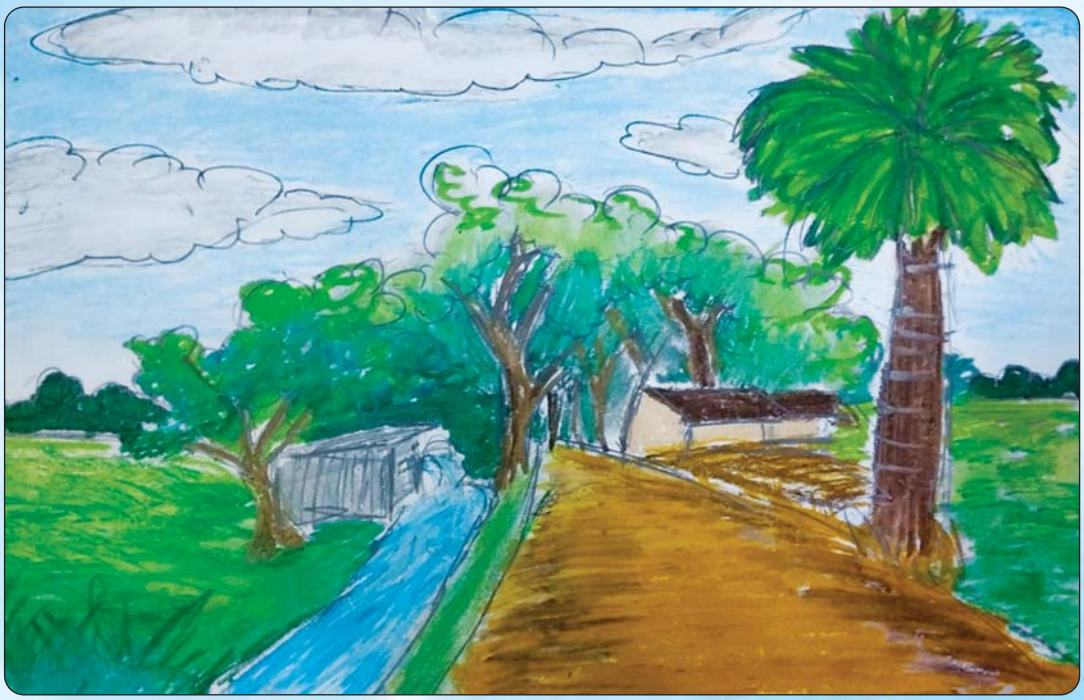

যুথি আখতার, পঞ্চম শ্রেণি, গালিমপুর রহমানিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, নবাবগঞ্জ, ঢাকা

সম্পাদকীয়

বিদায় নিলো ২০২৪ সাল। এসে গেল আরেকটি নতুন বছর ২০২৫। নতুন বছর বয়ে আনুক সবার জীবনে অনাবিল সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি। সহিষ্ণুতা, উদারতা আর পরস্পরের প্রতি ভালোবাসায় তৈরি হোক একটি মানবিক বাংলাদেশ। তোমাদের সবাইকে জানাই নতুন বছরের প্রাণঢালা শুভেচ্ছা।

নতুন বছর! নতুন ক্লাস! নতুন বই! কতই না আনন্দের। তাইতো বছরের প্রথম দিনে তোমাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় নতুন বই। নতুন বই নিয়ে স্কুলে হয় বই উৎসব। নতুন বইয়ের সুঘ্রাণে আনন্দে ভরে ওঠে মন। বইয়ের পাশপাশি পেয়ে যাই নতুন স্যার ও ম্যাডামদেরও। অনেক সময় আরো পেয়ে যাই নতুন নতুন বন্ধু। বন্ধুরা, নতুন ক্লাসের নতুন বই হাতে পেয়ে তোমরা নতুন উদ্যমে পড়াশুনা করবে। ভালোভাবে পড়াশুনা করে মা-বাবা ও শিক্ষকদের সুনাম বয়ে আনবে, উজ্জ্বল করবে দেশের মুখ–এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

নতুন বছরের আগমন মানেই নতুন আশা, নতুন স্বপ্ন ও নতুন শুরু। ভালো থেকো, নবারুণের সাথেই থেকো।

প্রধান সম্পাদক
খালেদা বেগম

সিনিয়র সম্পাদক
রিফাত জাফরীন

সম্পাদক
ইসরাত জাহান

সিনিয়র সহসম্পাদক
শাহানা আফরোজ

সহসম্পাদক
তানিয়া ইয়াসমিন শম্পা
মেজবাউল হক

সহযোগী শিল্পনির্দেশক
সুবর্ণা শীল

অলংকরণ
নাহ্‌রীন সুলতানা

সম্পাদকীয় সহযোগী
মো. মাছুদ আলম
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৮
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd

বিক্রয়, বিতরণ ও প্রদর্শনী
সহকারী পরিচালক
ফোন : ৮৩০০৭০২

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

মূল্য: ২০.০০ টাকা।

মুদ্রণ : মিতু প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

সূচি

নিবন্ধ

০৪ শিশুর ভাবনায় বই/ আলম শামস
৩৫ মজার তথ্য/ নাজমুল হোসেন ফারুক
৩৬ বই নিয়ে মনীষীদের উক্তি/ আশরাফুল আলম
৩৮ বারবি ডলের কথা/ এম. আতিকুল ইসলাম
৫২ সবচেয়ে বড়ো ১০ পাখি/ রায়হান সাইফুর চৌধুরী

গল্প

০৭ ময়নার নতুন স্কুল/ মেহেরুন ইসলাম
১১ ছোটো-বড়ো/ খায়রুল আলম রাজু
১৫ সবার প্রিয় মাইশা/ সাহেদ বিপ্লব
২০ ছোট্ট সোনা/ মুহাম্মদ মিজানুর রহমান
২৪ বই বাড়ি/ মাসুম মাহমুদ
২৬ রহস্যের সন্ধানে/ ইয়াছিন আরাফাত
২৮ ভোম্বল খানের মহাবিপদ/ আতিক রহমান
৩১ কাক ও কাঠবিড়ালি/ মামুন সরকার
৪০ গুলতিবাজ/ মাসুম বিল্লাহ
৪৪ কৌশল/ আঞ্জুমন আরা
৪৬ চাঁদনি দাদু/ গাজী আরিফ মান্নান
৪৮ ভূতের পিছু পিছু/ সালাম হাসেমী

ছোটোদের ছড়া

০৬ মো. মোজাম্মেল হক
১৮ নাজমুল হাসান সানি
১৯ মো. নজরুল ইসলাম
৩০ আহনাফ আহমেদ/ তুর্ণ রহমান/ মুশফিকা ফারহা

কবিতাগুচ্ছ

০৩ জাকির আবু জাফর
০৯ সাইফুল্লাহ ইবনে ইব্রাহিম/ জোনাঈদ হোসেন খান
১০ মো. মোজাহিদ হোসেন/ মোশাররফ হোসেন খান
১৯ রাজীব হাসান
২৩ কবির মাহমুদ

প্রতিবেদন

৫৫ মৃত সাগর কেন মৃত/ রেহানা বেগম
৫৬ শীতে শিশুর রোগব্যাধি/ মো. জামাল উদ্দিন
৫৭ ট্রি অফ লাইফ/ জিসান আহমেদ
৫৮ পদক জয়ী নাইমা/ জান্নাতে রোজী
৬০ দশ দিগন্ত/ সুমি আক্তার
৬২ বুদ্ধিতে ধার দাও/ নাদিম মজিদ

আঁকা ছবি

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ : সারা সানজিদা/ যুথি আখতার
তৃতীয় প্রচ্ছদ : অন্বেষা ঘোষ/ মোহাম্মদ ইয়াকুব বর্ণ
শেষ প্রচ্ছদ : সেজুতি শীল
৫১ আবিদা সুলতানা
৫৯ কায়নাত মারিয়া
৬৩ মাইমুনা বিনতে মাহফুজ
৬৪ মৌমিতা আক্তার বন্যা/ সাইয়ান খান

নবারুণ পত্রিকা পড়া ও ডাউনলোড করা যাবে

Nobarun Potrika

www.dfp.gov.bd

বইয়ের বুকে ঘুমায় মহাকাল

জাকির আবু জাফর

বই আমাকে বলল— তুমি পড়ো
পড়ে পড়ে মুক্ত জীবন গড়ো।
জীবন মানেই নতুন স্বপ্ন গান
জীবন মানে আনন্দ উদ্যান।

যে পড়ে না সে পড়ে যায় পিছে
নামতে থাকে নীচে, আরো নীচে।
কথায় কাজে নম্রতা নেই তার
তার কাছে নেই বইয়ের সমাচার।

গড়তে হলে পড়তে হবে শোনো
নেই এখানে একটুও ভুল কোনো।
আলসেমিকে রাখতে হবে দূরে
নিজকে সাজাও মহৎ জ্ঞানের নূরে।

যে পেতে চায় অনেক বড়ো মন
বইপড়া তার ভীষণ প্রয়োজন।
যে পড়ে তার কথায় মুক্তো ঝরে
এই পৃথিবী তাকেই সালাম করে।

যার থাকে না বইয়ের বুকে মুখ
তার জীবনে থাকবে অনেক দুখ!
তার জীবনে সুখ দেবে না ধরা
অবুঝ হলে, তখন কী আর করা!

তখন কি আর ছড়ায় জ্ঞানের জাল
বইয়ের বুকে ঘুমায় মহাকাল!

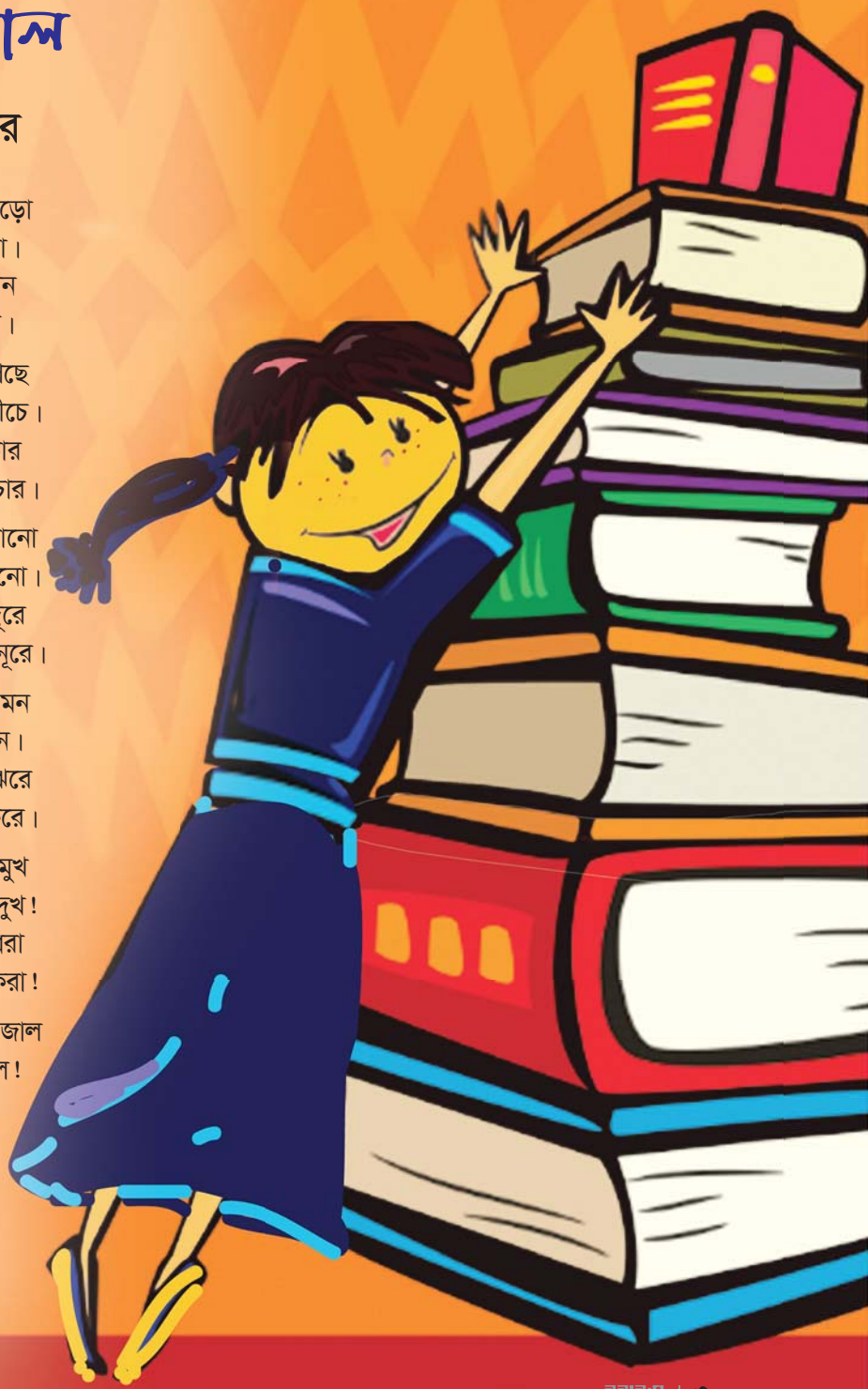

শিশুর ভাবনায় বই

আলম শামস

সবুজ মনের কচি মানুষ শিশু। শিশুরা দেখে দেখে শিখে, শুনে শুনে শিখে, চারপাশের পরিবেশ থেকে শিখে। এই দেখা, শোনা ও পরিবেশ থেকে শিখতে গিয়ে ভাবনার তৈরি হয়। এসব থেকে তার চিন্তার বিকাশ ঘটে। এর ফলে পৃথিবীকে, চারপাশের জগতকে বিশেষ করে দেশকে সে ধীরে ধীরে জানতে শিখে। শিশুর বয়স বাড়ার পাশাপশি তার চিন্তার পরিধি বাড়ে। বাড়ে ভাবনার জগৎ। শিশুর শারীরিক বৃদ্ধির সাথে সাথে তার মন-মনন-চিন্তা চেতনার পাশাপাশি বৃদ্ধি পায় নতুন কিছু করার ও জানার ভাবনা।

নতুন বছর নিয়ে, নতুন ক্লাস নিয়ে, নতুন বই নিয়ে, নতুন বন্ধু নিয়ে শিশু মনের নতুন নতুন ভাবনা তৈরি হয়। একজন মানুষের সবচেয়ে ভালো বন্ধু বই। বইয়ের চেয়ে ভালো বন্ধু আর কিছুই হতে পারে না। বই শুধু আনন্দের মাধ্যমই নয়, এ থেকে নানান কিছু শিখতে পারে একজন পাঠক। যা কোনো বন্ধু শেখাতে পারে না। বন্ধুর সঙ্গে একজনের ঝগড়া হতে পারে, কিন্তু বইয়ের সঙ্গে ঝগড়া নয় বরং বই নিজের মন-মননের বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে।

আমরা এখন শিশুদের কী দিচ্ছি? তথ্য-প্রযুক্তির এ যুগে তাদের হাতে তুলে দিচ্ছি অ্যানড্রয়েড ফোন। সেখানে নানা ধরনের গেম খেলে যে শিশু সময় কাটাচ্ছে, সে আসলে কতটুকু শিখছে? তার কল্পনা ও ভাবনার জায়গাটা কি তৈরি হচ্ছে? নাকি একটা গেম নিয়ে পড়ে আছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, যেটা তার মানসিক বিকাশে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে!

কচি মনের শিশুরা অনুকরণ প্রিয়। একটা বিষয় লক্ষ করবেন- পরিবারের বাবা-মা বা অভিভাবক যা করেন, শিশুদের মধ্যেও তা দেখা যায়। অর্থাৎ আপনজনরা যা করে, তারা তাই করার চেষ্টা করে। তাই বাবা-মা যদি বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলেন, তাহলে সন্তানরাও সেটাই অনুসরণ করবে। তারাও পড়তে বসবে।

শিশুরা গল্প পড়তে এবং শুনতে ভালোবাসে। তাই শিশুদের গল্প শুনান অথবা গল্পের বই কিনে দিন। আরও দিতে পারেন সায়েন্সফিকশন, যেটা শিশুকে ভাবনার জগৎ তৈরি করে দিবে। ভাবতে শেখাবে। শিশুরা প্রশ্ন করতে চায়। অনেক অভিভাবক আছেন, শিশুরা প্রশ্ন করলে বিরক্ত হন। মনে রাখবেন, শিশুদের আছে একটি কৌতূহলী মন। তারা কোনো কিছু না জানলে এবং না বুঝলে প্রশ্ন করবেই। তাদের প্রশ্ন করার সুযোগ দিন। প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করুন। কারণ শিশু প্রশ্ন না করলে সে শিখবে কী করে? যদি কোনো শিশু প্রশ্ন না করে, তাহলে বুঝতে হবে তার মধ্যে সমস্যা আছে। সে হয়ত ভয় পায় অথবা লজ্জা পায়। সে যদি কোনো বিষয় লুকায়, তাহলে অনেক কিছুই তার অজানা থেকে যাবে। পরবর্তী সময়ে সে সমস্যায় পড়বে। সম্পূর্ণভাবে তার মানসিক বিকাশ হচ্ছে না, এ কথা বিজ্ঞানও বলে। শিশুরা সামনের পৃথিবীকে কীভাবে নেতৃত্ব দিবে, যদি আমরা তাদের প্রশ্ন করার সুযোগ না দিই বা তাদের প্রস্তুত না করি।

কোনো শিশুর সঙ্গে প্রতারণা করা যাবে না। কারণ শিশু অবস্থায় সে যদি প্রতারণার শিকার হয়, তাহলে সে বড়ো মাপের প্রতারক হবে না, সেটার নিশ্চয়তা কী? তাই শিশুদের প্রতারিত না করে তাদের কথার গুরুত্ব দিতে হবে। তাদের বই পড়তে দিন। যদি সে কথা বলার সুযোগ পায়, তাহলে আরও কথা বলবে। এটি তার মানসিক বিকাশে সহায়ক হবে।

একটা দিকে লক্ষ রাখতে হবে- শিশুরা সবকিছুর মধ্যে সত্য খোঁজে। তাকে কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবধর্মী বই দিতে হবে। কারণ সে যদি বাস্তবতার মধ্য দিয়ে যায়, তাহলে নানা প্রতিবন্ধকতাকে তুচ্ছজ্ঞান করে এগিয়ে যেতে শিখবে। মনে রাখতে হবে, আজকের শিশুটিই আগামী দিনের পাঠক, লেখক। এজন্য তাদের হাতে বই তুলে দিতে হবে। তাহলেই সে পাবে নিজস্ব ভাবনার জগৎ।

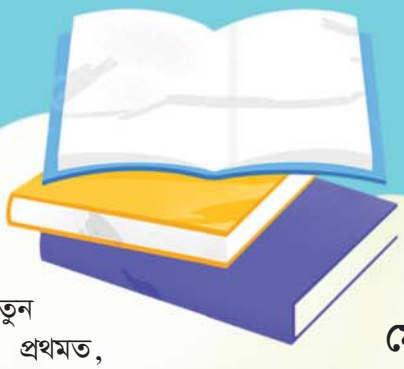

নতুন বছরের ভাবনা বিষয়ে নতুন বইয়ের শিক্ষার্থীর প্রত্যাশা প্রথমত, স্বাধীনভাবে লিখতে, পড়তে ও চলাচল করতে পারা। দ্বিতীয়ত, নতুন বছরে দেশের সহজ-সরল মানুষগুলোর সোজাসাপটা হাসিটা সবসময় দেখতে পাওয়া। তৃতীয়ত, দেশ যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছিল সেই সম্প্রীতি আগামীর দিনগুলোতে অটুট থাকবে এমনটাই প্রত্যাশা।

যে-কোনো মূল্যে আমরা সুন্দর একটা আগামী চাই। সুন্দর আগামী মানেই আমাদের ভালোভাবে বাঁচা। আর ভালোভাবে বাঁচতে পারা মানেই একে অপরের জন্য কিছু করতে পারা। আর আমরা যখন একে অপরের জন্য কিছু করতে পারব, তখন এমনিতেই আমাদের দেশ এগিয়ে যাবে। আমরা নতুন করে পথ চলতে পারব। নতুন স্বপ্নের কথা বলতে পারব। সবধরনের প্রতিকূলতা মাড়িয়ে এগিয়ে যেতে পারব সামনে।

নতুন বছরে তারুণ্য জেগে উঠুক নবউদ্যমে। নতুন বছরে তরুণরা নেতিবাচক বিষয়গুলো দূরে রেখে ইতিবাচক বিষয় খুঁজে বের করবে। বাস্তবতা যত বৈরি হোক তরুণ প্রজন্ম ধৈর্য ধরে তা মোকাবেলা করবে। নতুন বছরে এটা আমার একান্তই কাম্য। ❑

কবি ও সাংবাদিক

নতুন বই

মো. মোজাম্মেল হক

নতুন বছর এসেছে ভাই,
নতুন খাতা, বই পাই।
মলাট খোলা, রঙিন পাতা,
শেখার ছন্দে মনটা বাঁধা।

ছবির বই, অক্ষর নিয়ে,
শিখি আমরা গল্প দিয়ে।
রং তুলিতে স্বপ্ন আঁকি,
নতুন স্বপ্নের আনন্দে ভাসি।

মা বলেন, মনোযোগ দাও,
শিক্ষার আলো হৃদয়ে পাও।
শিক্ষক বলেন, যাবে ভালোবেসে,
থাকবে সবাই মিলেমিশে।

দ্বাদশ শ্রেণি, চন্দ্রনাথ কলেজ, নেত্রকোণা

ময়নার নতুন স্কুল

মেহেরুন ইসলাম

ময়নার বাবা মেডিকেল অফিসার। তার প্রথম পোস্টিং খাগড়াছড়ি ছিল। কয়েক বছর ওখানে কাজ করে নিজের এলাকায় চলে আসেন। কিন্তু নিজের এলাকায় বেশিদিন থাকা হলো না। কোনো নোটিশ ছাড়াই ঢাকা মেডিকেলে তার পোস্টিং হয়। তিনি অফিসে কথা বলেও কোনো পরিবর্তন করতে পারেননি। অফিসিয়াল সমস্যার জন্যই তাকে ঢাকায় বদলি করা হয়।

বাবার বদলির কথা শুনে ময়নার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। তার গ্রাম ছেড়ে যেতে একটুও মন চাইছে না। সারাদিন মন খারাপ করে পুকুর পাড়ে বসেছিল। কারো সাথে খেলতেও যাইনি। তার বন্ধুদেরও মন খারাপ। ময়না তাদের ছেড়ে চলে যাবে ওরা মানতেই পারছে না। ময়না ছাড়া ওদের খেলার আসর জমে না।

রাতে মোমেন সাহেব বাসায় ফিরেন। ময়নার মা টিকিট কেটে আসছি। কাল সকালেই আমরা ঢাকা যাচ্ছি। ময়না ঘুমের ভান করে জেগে আছে। বাবা মায়ের সব কথা শুনছে সে।

ময়নার স্কুলে কথা বলেছ?

হুম, ওটা নিয়ে তোমার ভাবতে হবে না। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও।

ময়না এক লাফে উঠে পড়ে।

বাবা আমরা কী আর কোনোদিন গ্রামে আসব না?

বোকা মেয়ে, আসব তো।

ছুটি পেলেই চলে আসব।

তুমি ঘুমাওনি কেন?

বাবা আমার ঘুম আসছে না। জুঁই, বেলি, রিতু, রিহান, সাদ সবাইকে ছেড়ে যেতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে বাবা।

পাগলি মেয়ে, কাঁদে না।

ঢাকাতে তুমি অনেক বন্ধু পাবে। তোমার ঢাকার বন্ধুরাও খুব ভালো। আর ঢাকাতো খুব মজার জায়গা।

কে বলেছে বাবা?

আমি বলছি। ঢাকায় কতকিছু আছে। দেখেই তোমার মন ভালো হয়ে যাবে।

ঢাকায় কী কী আছে বাবা?

জাদুঘর, চিড়িয়াখানা, শিশুপার্ক, বিমান, ট্রেন আরো কত কী! ছুটির দিনে তোমাকে ঘুরতে নিয়ে যাব।

এবার খুশি তো?

ময়না মাথা নাড়ল।

তাহলে এবার ঘুমাও মামনি।

সকালে ময়না ও তার বাবা- মা ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। বিকাল না হতেই তারা ঢাকা মেডিকেল পৌঁছে যায়। তারা মেডিকেল অফিসার কোয়ার্টারে ওঠে।

সকালে মোমেন সাহেব অফিসের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যায়। আর ডলি বেগম মেয়ে নিয়ে স্কুলে যায়। নতুন স্কুলে ভর্তি করে দেয় ময়নাকে। নতুন স্কুল, নতুন জায়গা ময়নার মন কেড়েছে। বিশাল বড়ো স্কুল দেখেই সে খুশিতে আত্মহারা।

নতুন স্কুলে সবার সাথে পরিচিত হলো ময়না। তার শিক্ষকরাও খুব ভালো, আন্তরিক। প্রথম দিন ভালোই কাটল।

দুই-তিন দিন হয়ে গেল। তবুও ময়নার সাথে কেউ ভালোভাবে মেশে না, কথা বলে না। ময়নার আর এ স্কুল ভালো লাগছে না। তার গাঁয়ে ফিরে যেতে মন চাইছে। মিস করছে তার প্রিয় বন্ধুদের।

ময়না অনেক মেধাবী। সব ক্লাসেই পড়া পারে সে। শিক্ষকদের প্রিয়মুখ কিন্তু শিক্ষার্থীরা তার সাথে হিংসা করে। কেউ তার সাথে মেশে না, কথাও বলে না।

টিফিনের সময় ময়না চুপচাপ ক্লাসরুমে বসে আছে। অথচ সবাই খেলছে, হই-হুল্লোড় করছে। এ বিষয়টা তার এক শিক্ষক খেয়াল করলেন।

ময়না তুমি একা বসে আছো কেন?

স্যার আমার ভালো লাগছে না।

কেন ময়না? তোমার কি মন খারাপ?

হ্যাঁ স্যার।

কেন তোমার মন খারাপ আমাকে একটু বলো।

জানেন স্যার ক্লাসের কেউ আমার সাথে মেশে না, ওরা আমাকে খেলতেও নেয় না।

ও, আচ্ছা। মন খারাপ করো না। আমি ওদের বলে দেবো। তোমার সাথে সবাই মিশবে।

টিফিন শেষে সবাই আবার ক্লাসে ফিরল। স্যারও ক্লাসে এলেন।

তারপর ময়নাকে সামনে ডাকলেন।

তোমরা সবাই একে চিনো?

চিনি স্যার।

তাহলে ওর সাথে মেশো না, খেলতে নাও না কেন?

সবাই চুপ, কেউ কিছু বলছে না।

সবাই চুপ করে আছো কেন? কথা বলো।

এটা কি তোমরা ঠিক করছো?

না, স্যার। আমাদের এটা করা উচিত হয়নি।

ময়না তোমাদের নতুন বন্ধু। ও ওর সব বন্ধুদের ছেড়ে তোমাদের কাছে আসছে। এমনিতেই ওর মন খারাপ, তারপরে তোমরা যদি না মেশো, ওর সাথে না খেলো তাহলে কি ওর ভালো লাগবে?

লাগবে না। তাই আজ থেকে তোমরা ওর সাথে মিলেমিশে থাকবে।

সবাই এসে ময়নাকে ঘিরে ধরল।

আমরা তোমার বন্ধু হবো।

ময়না খুব খুশি। সে হাসতে হাসতে বলল, আজ থেকে আমরা সবাই বন্ধু। একসাথে পড়ব, খেলব আর খুব খুব মজা করব। ❑

সিনিয়র স্টাফ নার্স, সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সাতক্ষীরা।

নতুন ভাবনা

সাইফুল্লাহ ইবনে ইব্রাহিম

নতুন বছর নতুন ক্লাসে
নতুন বইয়ের ঘ্রাণে,
আনন্দেতে মেতে উঠি
খুশি প্রাণে প্রাণে।

নতুন বছর নতুন করে
পড়ায় দেব মন,
রুটিন মাফিক চলব আমি
দিনের সারাক্ষণ।

তবেই আমার জীবনখানি
হবে অনেক ভালো,
জ্ঞানের আলোর জীবন থেকে
সরে যাবে কালো।

রুটিন মাফিক চলি যদি
হবে অনেক সুখ,
সফলতা দেবে ধরা
দূরে রবে দুখ।

বই বন্ধু

জোনাঈদ হোসেন খান

নতুন বছর, নতুন আশা,
নতুন বইয়ে ভরে ভাষা।
আসো সবাই বই পড়ি,
জ্ঞান দিয়ে সমাজ গড়ি।

গল্প পড়ে সময় যায়,
ভাবতে ভাবতে মনটা চায়-
আরো জানি, আরো শিখি,
বইয়ের সাথে বন্ধুত্ব গড়ি।

সিংহ, পাখি, রঙিন ফুল,
সবই থাকে বইয়ের কূল।
প্রতিটি বই জ্ঞানের জাহাজ,
মনকে ভাসায় আজ।

নতুন বছরের স্বপ্ন

মো. মোজাহিদ হোসেন

নতুন বছর, নতুন সকাল,
নতুন করে শুরু হোক কাল।
বইয়ের সাথে নতুন পরিচয়,
আনন্দে ভরে উঠুক হৃদয়।

রংতুলিতে আঁকি ছবি,
নতুন খাতা, নতুন হবি।
শিশুরা সব স্বপ্ন গাঁথে,
আলোর পথে পা রাখে।

বন্ধু মিলে গাই গান,
নতুন বছরে নতুন প্রাণ।
ভালোবাসা, মমতার বাঁধন,
এই হোক জীবনের সাধন।

নতুন বছর, নতুন পথ,
ভালো কাজের নেব শপথ।
পড়ি-শিখি, হাসি-গাই,
ভবিষ্যতের আলো ছড়াই।

স্বপ্ন দেখি

মোশাররফ হোসেন খান

জগৎ জুড়ে ছড়িয়ে আছে স্বপ্ন হাজারো
স্বপ্ন দেখার স্বাধীনতা আছে আমারও।
স্বপ্ন দেখা অনেক মজা স্বপ্ন আনে সুখ
হাজার তারা স্বপ্ন এনে ভরিয়ে দেয় বুক।
স্বপ্ন ভাসে মেঘের চোখে চাঁদের পিঠে ভাসে
স্বপ্নগুলো পালক নেড়ে সকল খানে হাসে।
সাগর নদী নীল আকাশে আছে স্বপ্ন ভরা
শিখতে হয় কেমন করে স্বপ্ন যায় ধরা।
স্বপ্নের সাথে বসত করি স্বপ্নের সাথে চলি
শত স্বপ্ন দেয় যে দোলা, কয়টা আর বলি?
স্বপ্ন দেখি দিনের বেলা, ঘুমের মাঝে নয়
চাষির মতো স্বপ্নগুলো করতে থাকি জয়।
আমার কাছে স্বপ্ন মানে ঘুরিয়ে দেওয়া চাকা
আলোর সাথে ভালোর সাথে সকল সময় থাকা।
পালটে দেবার স্বপ্ন দেখি কালের স্রোতোধারা
এমন স্বপ্ন দেখতে পারো সাহস রাখো যারা।

ছোটো-বড়ো

খায়রুল আলম রাজু

রোজ সকালে ছোটো ছোটো পাখিদের কিচিরমিচিরে ঘুম ভাঙে ছোট্ট ইমির। এতটুকুন মেয়ে, কী সুন্দর বড়োদের মতো আড়মোড়া ভেঙে ছোটো ছোটো পায়ে দৌড়ে আসে বারান্দায়! ঘুম ঘুম চোখে ইমি দেখে, ঘরের গুলগুলিতে থাকা কত্তগুলো পাখি বসে আছে বারান্দার গ্রিলে। একটা দু'টো উড়ে যাচ্ছে আবার আসছে , আরও কয়েকটা বারান্দার মেঝেতে হাঁটাহাঁটি করছে। ইমি একগাল হেসে সেই পাখিদের

ধরতে গেলে তারা ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল বাড়ির বড়ো কাঁঠাল গাছটায়। ইমি, হি! হি! হেসে, এসো, এসো পাখি, এসো আমার কাছে- বলে ডাক শুরু করল। ইমির সোনা বাবা এসব দেখে হাসলেন। সোনা বাবা তার ছোটো ফুফুর স্বামী। ইমি, রিমিরা ফুফুকে সোনা মা আর ফুফাকে সোনা বাবা ডাকে। বারান্দার ইজি চেয়ার থেকে উঠে সোনা বাবা ইমিকে কোলে নিয়ে চুমো খেলেন। কাতুকুতু দিয়ে বললেন, এই পাখিদের নাম কী মা?

ইমি বলল, জানি না,
কী নাম ওদের?

সোনা বাবা বলবার আগেই রিমি এসে বলল, এই পাখিদের নাম চড়ুই। আমি জানি। অবাক হয়ে সোনা বাবা বললেন, তুমি জানলে কী করে? ক্লাস থ্রিতে পড়ুয়া রিমি হেসে হেসে বলল, আপনার নতুন বই 'পাখিদের নাম, পাখিদের দাম' পড়ে জেনেছি। হি! হি! হি! হাসল রিমি। সাথে ইমিও। সোনা বাবা লেখক। ছোটোদের জন্য ছড়া, কবিতা, গান আর গল্প লিখেন। উনার লেখা অনেকগুলো বইও আছে। রিমি রোজ সোনা বাবার লেখা বই পড়ে। সে সোনা বাবার 'পাখিদের ছড়া' বইটি থেকে চড়ুইপাখি নামের একটি ছড়া শোনালো। কচি কণ্ঠে সে বলল,

ছোটো পাখি চড়ুই
খাবে পোকা, ডাল-ভাত
কাঁচা-পাকা বড়ুই?...

বাহ! বাহ! দারুণ! বলতে বলতে সোনা বাবা হাততালি দিলেন। ইমি বলল, সোনা বাবা, আমিও পাড়ি, আমিও পাড়ি- আমিও বলি? সোনা বাবা একগাল হেসে বললেন, হ্যাঁ, তুমিও বলো।

ইমি, আধো আধো বুলে আমতা আমতা করতে করতে নেচে-গেয়ে বলল,

তোতো তাকি তড়ুই
খাবে বোকা, লাল-দাঁত
চাচা-বাঁকা কড়ুই?...

ইমির ছড়া শুনে রিমি কী অট্টহাসিই না হাসল! হাততালি দিয়ে বলল, বাহ! দারুণ! দারুণ! বলতে বলতে সোনা বাবাও হাসলেন। ইমিও হাসল। ওসব শুনে একটু পর হাসতে হাসতে সোনা মা আসলেন সকালের নাশতা নিয়ে। সোনা মার পিছুপিছু হামাগুড়ি দিয়ে হাসতে হাসতে আসল ইমি। নাশতার টেবিলে রাখা হলো; ডিম, পাউরুটি, পোলাও, গোশত ভুনা, কলা, আপেল, তালপিঠা এটা সেটা আরও কত কী মজাদার খাবার। দাঁত ব্রাশ ও হাত-মুখ ধোয়া শেষে সোনা বাবা হিমিকে নিয়ে খাচ্ছেন। ইমি আর রিমি খায় না।

ইমি, রিমি ডিম খায় না। ভাত খায় না। মাছ খায়

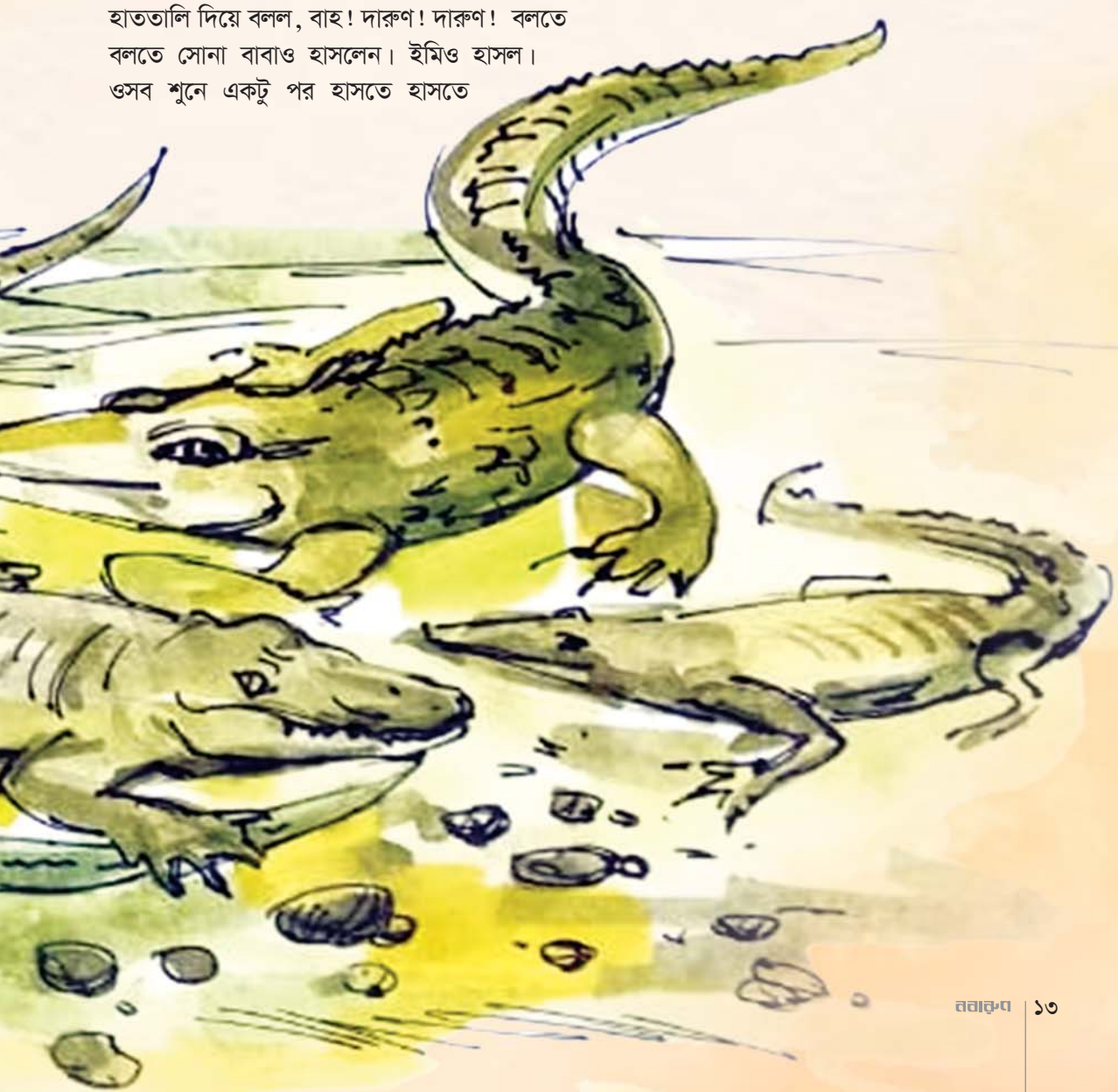

না। ফল খায় না। পাউরুটির সাথে ফ্রুটস জেলি মাখিয়ে গপগপিয়ে কোনোদিন খায়নি। খায়নি গোশত ও ঝোলের সাথে ধবধবে সাদা গন্ধমাখা পোলাও, ভাত-কোনো কিছু।

খেতে খেতে সোনা বাবা কতবার যে ওদের সাধাসাধি করলেন তার হিসাব নেই। রিমি শেষে বলল, সোনা বাবা, গল্প বলো, গল্প বললে খাবো। ইমিও বলল, গপ্পো তুনব। গপ্পো তলো সোনা বাবা হি! হি! হি! হাসলেন। ইমি ছোট্ট কি-না তাই, গল্পকে গপ্পো, বলোকে তলো, শুনবকে তুনব আরও কত কী উলটাপালটা কথা বলে। সোনা বাবা ওদের খাবারের প্রতি মনোযোগ বাড়াতে শুরু করলেন মজার এক নতুন গল্প। সেই গল্পের নাম, 'ছোটো-বড়োর গল্প'।

সোনা বাবা শুরু করলেন ঠিক এইভাবে,

অনেক অনেক দিন আগে বড়ো এক সমুদ্রে থাকতেন এক মা কুমির। তার ছিল চারখানা ছানা। বয়স দুই মাস পনেরো দিন। সমুদ্রে বড়ো বড়ো ঢেউ এলে ছানাগুলো ভয় পেত। মা কুমির তাই তাদের সমুদ্রের বড়ো এক দ্বীপের পাড়ে রাখলেন। সেখানে ছিল চিকচিকে উজ্জ্বল ঝরঝরে বালি। রোজ সকালে কাঁচা হলুদ সোনা ঝরা রোদ এসে পড়ত তাদের শরীরে। ছানা চারটি সেখানে হাঁটত, নাচত, গাইত, খেলত। খুনসুটিতে মেতে থাকত সারাদিন-রাত। শুধু সকালে, দুপুরে আর রাতে মা কুমির খেতে ডাকতেন তাদের। ছোটো দু'টো ছানা সময়মতো ভাত খেত, সমুদ্রের বড়ো বড়ো মাছ খেত। উটপাখির ডিম, সমুদ্রের নিচের সবুজ রঙিন গাছ, মজাদার আরও কত কী খাবার খেত। কিন্তু বড়ো দু'টো ছানা ভাত খেতো না। ডিম খেত না। মাছ খেত না। গাছ, লতা কিচ্ছুটি খেত না!

দিন যায়। মাস যায়। বছরের পর বছর চলতে থাকে। ছোটো দু'টো ছানা ধীরে ধীরে বড়ো হলো। সমুদ্রের ঢেউ দেখলে তারা আর ভয় পায় না। কী সুন্দর ভেসে থাকে! সমুদ্রের গভীরে যায়। নিজে নিজে খাবার খায়। আর বড়ো দু'টো ছানা না খেতে খেতে ঠিক আগের সমানই রয়ে গেল। সমুদ্রের বড়ো বড়ো ঢেউ দেখলে এখনো ভয় পায়। সাঁতার জানে না। জলে নামে না। বালিতে হাঁটে, খেলে, নাচে আর গান গায়!

চার-ছয় বছর পর এক সকালের ঘটনা। ছোটো ছানা দু'টো এখন পুরোপুরি কুমির। অন্যদিকে বড়ো ছানা দু'টো ঠিক আগের সমান ছোটোটিই রয়ে গেল। উচ্চতা আর আকারে ঠিক টিকটিকিদের সমান। মা কুমিরের মন খারাপ। ভীষণ অখুশি হয়ে তিনি দ্বীপের বালিতে বসে রইলেন। কুমিরের আকারের সমান বড়ো ছানাদের তিনি নতুন দেশের পথে পাঠিয়ে দিলেন। তারা নতুন এক দিগন্তের খোঁজে সমুদ্রপথে ছুটে চলল নতুন এক জীবনযাত্রায়। আর টিকটিকির সমান ছানাদের কলাগাছের ভেলায় করে একটাকে শহরে আর অন্যটিকে গ্রামের দিকে পাঠালেন মা কুমির। সেই থেকে সমুদ্র ও নদীতে, বনে-জঙ্গলে আমরা কুমিরদের দেখে থাকি। চিড়িয়াখানাতেও তারা থাকে। শহরের বাড়ির ছাদে, দেয়ালে, গ্রামের ঘরবাড়িতে যাদের দেখি তারাই- টিকটিকি। না খেতে খেতে তারা সেই ছোটোটিই রয়ে গেল। আর তাদের বড়ো দু'টো কুমির ভাই, দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ইমি আর রিমি অবাক হয়ে চেয়ে রইল সোনা বাবার দিকে। তাদের চোখগুলো যেন কপালে উঠে যাবে! মনে মনে হয়ত মেয়ে দু'টো বড্ড ভয় পেয়েছে! আজ থেকে ঠিকভাবে শুরু হবে তাদের খাবারদাবার। মাছ খাবে, ডিম খাবে, শাকসবজি-ফলমূল- যা কিছু আছে স্বাস্থ্যকর সবকিছু । ঠিক তখন সোনা বাবা ছড়ার ছন্দে বললেন,

বলো দেখি ছোটো-ছোটো খুকুমণিরা
কুমিরেরা বড়ো আর টিকটিকিরা...

উত্তরে ইমি, রিমি একসাথে দু-হাত তুলে সুরে সুরে বলে উঠল, ছোটো, ছোটো, টিকটিকিরা ছোটো; ওদের বাঁধভাঙা সেই উল্লাসে হিমিও হামাগুড়ি দিয়ে এক পা পরিমাণ এগিয়ে দু'হাত উপরে তুলে হি হি করে কী জানি কী ভেবে খিলখিল করে হেসে উঠেছিল! ❑

নির্বাহী সম্পাদক, ছোটোদের পত্রিকা শিশুটামি।

গল্প

সবার প্রিয় মাইশা

সাহেদ বিপ্লব

মাইশা ছয়-সাত বছরের মেয়ে, বলা চলে মা-বাবার খুব আদরের মেয়ে। মাথার চুলগুলো ভালো করে বেনি বাঁধা থাকে সব সময়। মাঝে মাঝে ফিতা দিয়ে ফুল করে দেয় মা। তখন মাইশাকে অন্য রকম লাগে। মনে হয় ছোটো এক ফুলপরি। সারাদিন বই নিয়ে পড়ে থাকতে ভালো লাগে তার। একেবারে বই পড়ার পোকা। ছোটোবেলায় অন্য ছেলে-মেয়েরা নানান কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও মাইশা বই নিয়ে ব্যস্ত থাকত। হাতের কাছে বই পেলে অন্য কিছু নিত না। পাতা উলটিয়ে ছবি দেখত। ছবিতে চুমু খেত। ছোটো ছোটো শব্দ করে কী যেন বুঝাতে চাইত তা কেউ বুঝত না। তবে বই পেলে আনন্দ পেত।

সেই থেকে সবাই বুঝে গিয়েছিল বই পেলে মাইশা খুব খুশি হয়। সেই যে বই পাগল মেয়েটি আজও বই নিয়ে পাগল থাকে। স্কুলে ভর্তি করতে গেলে স্যার তার প্রতিভা দেখে বেশ অবাক হলো। যা পড়তে বলে তাই পড়ে ফেলে চটপট।

কোন ক্লাসে ভর্তি করবে স্যার খুব চিন্তায় পড়ে গেল। তারপর ওয়ানে ভর্তি করা হলো মাইশাকে। এখন তার প্রতিদিনের কাজ হলো স্কুলের সকল পড়া রেডি করা। হাতের লেখা ঠিকঠাক করে রাখা। মাইশাকে নিয়ে মা-বাবা তেমন চিন্তিত না। সকল ছেলে-মেয়েরা মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও মাইশা মোবাইল তেমন দেখে না। তার বই হলেই হয়ে গেল।

বাবা প্রতিদিন নতুন বই কিনে আনেন। সাথে থাকে ছোটোদের পত্রিকা। বাজারে এখন নতুন নতুন ছোটোদের পত্রিকা প্রকাশ হয়। সেখানে ছোটোদের মজার মজার গল্প থাকে। ছড়া থাকে। পৃথিবীকে জানার অনেক কিছু থাকে এই পত্রিকায়। মাইশা পত্রিকা পড়ে মনোযোগ দিয়ে।

তার পড়া দেখে সকলে ভাবে এ আবার কেমন মেয়ে। সারাদিন বই নিয়ে থাকতে পারে। অন্য বাড়ির ছেলে-মেয়েদের মা-বাবা মাইশার কথা বলে তাদের উপমা দেয়। তোমরা মাইশার মতো পড়তে পারো না? সারাদিন বই নিয়ে পড়ে থাকে মেয়েটি। আর তোমরা বই পড়তেই চাও না। তাহলে মানুষ হবে কীভাবে?

স্কুলে গেলেই স্যারদের কাছে অনেক প্রশ্ন করে, স্যার এটা কীভাবে হলো, ওটা কীভাবে হলো ইত্যাদি ইত্যাদি।

মাইশার কিছু কিছু প্রশ্নের উত্তর স্যারও জানেন না। তবু স্যার এইভাবে সেইভাবে উত্তর দিতে চেষ্টা করেন। মাইশা বলে স্যার উত্তরটা এমন হবে না।

উত্তর হবে এইভাবে।

স্যার লজ্জা পেয়ে বলে, আমাদের মাইশা অনেক জ্ঞান রাখে। বড়ো হয়ে ডাক্তার হবে, আমাদের ভালো ভালো ঔষধ দিবে।

সবাই হাসে স্যারের এমন উত্তর শুনে।

একদিন মাইশা পড়ছে, এমন সময় একটা শব্দ হলো। মাইশা তাকিয়ে খুঁজল কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। আবার পড়ায় মন দিল। আবার শব্দ হলো। মাইশা আবার তাকিয়ে দেখল। তখনো দেখল কেউ নেই তার রুমে। কিন্তু মনে হচ্ছে কে যেন তার রুমে এসেছে। মানুষের মতো কেউ যেন হাঁটছে।

তেমন কেউই নেই রুমের ভিতর। এক সময় টেবিল থেকে উঠে গিয়ে ভালো করে রুম দেখতে লাগল। মাইশার কেন যেন মনে হচ্ছে এই রুমের ভিতর কেউ এসেছে। অনেক খোঁজার পর দেখল খাটের নিচে কে যেন বসে আছে।

বড়ো মানুষের মতো জিজ্ঞাসা করে কে তুমি? এখানে কেন ? বেড়িয়ে এসো।

মাইশার মতো ছোটো একটা মেয়ে খাটের নিচ থেকে বেড়িয়ে এল।

তুমি এখানে কেন?

মা আমাকে খুব মেরেছে। তাই তোমার কাছে এসেছি। আমি পড়তে পারি না। সারাদিন গেম খেলি। তুমি কি আমার একটা উপকার করতে পারো ?

কোনো চিন্তা নেই, মানুষ তো মানুষের উপকার করে।

আমি মানুষ না। আমি পরির মেয়ে।

মেয়েটির কথা শুনে মাইশা ভয় পেয়ে মাকে ডাকতে চায়।

পরির মেয়েটি মুখ টিপে ধরে থামিয়ে বলে, ভয় পেয়ো না। আমি তোমার ক্ষতি করতে আসিনি। আমি খুব ভালো মেয়ে। শুধু পড়ি না বলে মা আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন। মা বলেছেন, তুমি নাকি ভালো পড়ো। চারিদিকে তোমার পড়ার সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে।

তাই নাকি! একটু সাহস নিয়ে বলল মাইশা।

শুধু তাই না, আমাদের পরির রাজ্যে তোমার সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে।

মাইশা একটু হাসল।

বন্ধু তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিও না। তাহলে আমার আর কোথাও স্থান হবে না। আমি পড়তে পারি না, একটু থেমে আবার বলে, আমি অনেক আশা নিয়ে তোমার কাছে এসেছি। আমাকে তাড়িয়ে দিও না, কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলল। আমি শুধু তোমার পাশে বসে থাকব।

মাইশা চিন্তা করতে লাগল।

চিন্তার কিছু নেই। আমি তোমার পাশে বসে থাকব। তোমার পড়া হয়ে গেলে আমি চলে যাব।

কিন্তু ।

কোনো কিন্তু না বন্ধু।

মা-বাবা যদি তোমাকে দেখে ফেলে তাহলে তো অনেক বিপদ হবে। মা -বাবা ফকির আনবে। ফকির দিয়ে তোমাকে ধরে বোতলে ভরে রাখবে।

তা হবে না।

কেন?

আমাকে তোমার মা-বাবা দেখবে না। আমি রাতে পড়ার সময় আসব আর তোমার পড়া শেষ হলে চলে যাব। আমাকে ফিরিয়ে দিও না। ফিরিয়ে দিলে আমার জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে।

আচ্ছা ঠিক আছে। তবে আমাকে কথা দিতে হবে তুমি আর গেম খেলবে না।

ঠিক আছে খেলব না।

গেম খেললে পড়া মনে থাকে না। সারাদিন গেমের চিন্তা থাকে মাথার ভিতর।

ঠিক আছে আমি আর গেম খেলব না।

ঠিক আছে, আমার সাথে পড়তে বসো। আমি পড়ব তুমি দেখবে ঠিক আছে?

জি আচ্ছা।

মাইশা পড়ছে আর পরির মেয়েটি দেখছে মাইশা কীভাবে পড়ে।

পরির মেয়েটি মাইশার পড়ার নিয়মটা ধরার চেষ্টা করছে।

অনেকক্ষণ পড়া দেখার পর মাইশা বলল, আমার পড়ার নিয়ম তুমি বুঝতে পারছ?

জি কিছু কিছু বুঝেছি। আর কিছুদিন সময় লাগবে।

মাইশার পড়া শেষ হলে পরি মেয়েটি চলে গেল।

এভাবে প্রতি রাতে পরি মেয়েটি আসে মাইশার কাছে পড়া শিখতে।

এভাবে দিন-মাস চলতে লাগল। এখন পরি মেয়েটি অনেক ভালো পড়তে পারে। পরির রাজ্যে তার সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে।

এই কারণে লোকে বলে ভালো মানুষের কাছে থাকলে ভালো মানুষ হওয়া যায়। আর খারাপ মানুষের কাছে থাকলে খারাপ হবেই।

এখন মাইশার ভালো বন্ধু হয়ে গেছে পরির মেয়েটি। মাঝে মাঝে মাইশার সাথে ঘুরতে যায়। পরির মেয়েটি মাঝে মাঝে পরির রাজ্য থেকে মাইশার জন্য ভালো ভালো খাবার নিয়ে আসে। এমন একটি বন্ধু পেয়ে মাইশা খুব খুশি। খুব একটা মান-অভিমানও হয় না তাদের। ❑

প্রকাশক : টইটই প্রকাশন

স্কুলের আনন্দ

নাজমুল হাসান সানি

সকালবেলা ঘুমটা ভাঙে,
স্কুলে যাব- মনটা রাঙে।
ব্যাগে ভরে বই-খাতা,
স্কুলের দিকে দেই হাঁটা।

শিক্ষক যখন পড়াতে আসেন,
মন দিয়ে সব শিখি
বাংলা, গণিত, বিজ্ঞান
আরো শিখি ইংরেজি।

নতুন বছর এনেছে গান,
পড়াশোনায় জমুক প্রাণ।

ষষ্ঠ শ্রেণি, সিদ্ধেশ্বরী স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

নতুন বইয়ের গন্ধ

মো. নজরুল ইসলাম

আজকে সকাল রঙিন হলো
স্কুলের আঙিনায় সবাই চলো
নতুন পড়া করব শুরু
পড়া লেখায় হবো না ভিরু

বই উৎসব, খুশির ভেলা,
সব বন্ধু মিলে করছে খেলা।
হাতে হাতে নতুন বই
ছাপার ঘ্রাণে মন যে ছুঁই।

সবার মুখে হাসির রোল,
নতুন বই পড়ায় মশগুল।
বইয়ের ভাঁজে স্বপ্ন লুকায়,
জানার জগৎ চোখে ফুটায়,

নতুন বইয়ের রঙিন কথা,
ভুলে যাই সব দুঃখ-ব্যথা
খাতা-কলম সাজিয়ে রাখি,
সকাল-সন্ধ্যা পড়ায় থাকি।

[অষ্টম শ্রেণি, বিদ্যাময়ী স্কুল, ময়মনসিংহ]

আগামীর অঙ্গীকার

রাজীব হাসান

পুরোনোকে বিদায় করে
নতুনের দিকে এসো
দেশ সাজাব দশে মিলে
বসেই হিসাব কষো।

নতুন দিনের নতুন স্মৃতি
আঁকড়ে ধরে সবাই
এসো আমরা মিলেমিশে
নতুনের গান গাই।

নতুন দিনের শপথ নিয়ে
সত্যের পথে থাকি
ন্যায়-অন্যায় বিচারটাকে
সামনে ধরে রাখি।

সব ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে
শপথ নেই একসাথে
সুন্দর আগামীর দেশ গড়ব
হাতটা রেখে হাতে।

অতীত ভুলে ভবিষ্যৎ হোক
আগামীর অঙ্গীকার
সবাই মিলে করতে পারি
উন্মোচন নতুন দ্বার।

গল্প

ছোট্ট সোনা

মুহাম্মদ মিজানুর রহমান

জিনিয়া রহমান মেয়েটির নাম কী রাখবেন কিছুতেই মেলাতে পারছেন না। একটার পর একটা নামের চিন্তা মাথায় এলেও ঠিক পছন্দের নামটা এখনো আসছে না। কল্পনার রং মিশিয়ে পছন্দের নাম খুঁজছেন তিনি। একদিন এই ছোট্ট শিশুটি সকলের মন জয় করবে। সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়বে তার নাম। তাই নামটি যদি ব্যক্তিত্বের চেয়ে হালকা হয়ে যায়, মোটেই ভালো দেখাবে না বিষয়টি। রাজা নামের সবাই যদি রাজা হয়ে যায়, তাহলে রাজা-রানিতে ভরে যেত পুরো দুনিয়াটা। তবুও ভাবেন, যদি সন্তান কখনো প্রশ্ন তোলে, মা, তুমি তো চাইলে মেয়ের সুন্দর একটা নাম দিতে পারতে? জিনিয়া রহমান কিছুতেই যেন স্থির হতে পারলেন না। হয়ত মেয়ে কখনোই এই প্রশ্ন তুলবে না। তার পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলে শিশুরা এক মনোরম পরিবেশে বেড়ে ওঠে। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা তাদের পারিবারিক ঐতিহ্য। পরবর্তী প্রজন্মও এটিকে ধারণ করে চলছে। উপলব্ধি করতে পারছে নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যবোধ। সেই শিক্ষা দিয়েই শিশুদের গড়ে তোলেন তারা। যাতে সামাজে সুন্দর মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

জিনিয়া রহমান ভাবেন, শিশুটিকে যদি সুন্দর একটা নাম দিতে পারি এটাইবা কম কীসে। তাহলে ব্যাপারটা বেশ আনন্দেরই হয়। হয়ত সন্তান একদিন খুশি হয়ে বলবে, মা আমার সুন্দর একটা নাম দিয়েছে। কী চমৎকার অর্থে ভরা আমার নামটি!

বসে আছেন জিনিয়া রহমান। নানা জল্পনা ও কল্পনা মনের কোনে উঁকি দিচ্ছে। ঠিক এমন সময় ওয়ানিয়া মায়ের কাছে ছুটে এল। মায়ের ললাটে এঁটে দিলো ভালোবাসার চুমু। পরম মমতায় মা সন্তানকে বুকে তুলে নিলেন। নিজের গালটা মুছতে লাগলেন। দুধাল সেই মায়াবি চুমুর গন্ধ এখনো তার গাল জুড়ে ছড়িয়ে আছে। কচি হাতের পরশে সে মায়ের কাছে আদুরে বায়নায় জানিয়ে দিলো, মা, হাতটি মাথায় বুলিয়ে দাও না। জিনিয়া রহমান মায়াভরা চোখে ওর দিকে তাকালেন। আর ভাবতে লাগলেন, মেয়েটি কত মমতা দিয়ে কথা বলছে! কত নম্রভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে শিখেছে।

জিনিয়া রহমান মেয়ের চিন্তা ও মননে এক অন্যরকম মানুষ দেখতে পান। খুঁজে পান এক দরদি ও

মানবতাবাদী মানুষের ছায়া। গরিব-দুঃখী মানুষের প্রতি যার রয়েছে পরম মমত্ববোধ।

জিনিয়া রহমান শিশুটিকে কোলে নিয়ে একটু আদর করলেন। ছোট্ট শিশু মাকে এমনভাবে কাছে টেনে নিল, যেমন পাখির ছানা পরম মমতায় তার মা পাখিটাকে বুকে জড়িয়ে নেয়। বহুক্ষণ ধরে বুকে চেপে রাখলেন শিশুটিকে। কিছুক্ষণ পর তিনি বললেন, এখন আমায় যেতে হবে। হাতে অনেক কাজ। মুখে বলছেন ঠিকই, কিন্তু কিছুতেই তিনি ওর মায়া থেকে বেরিয়ে আসতে পারছেন না।

শিশুটির সবসময়ের সঙ্গী ওর মা। ওকে নিয়ে তিনি অনেক আনন্দ পান। ওই যেন তার আলাদা একটি ভুবন। যা তার সমুদয় জীবন যন্ত্রণা ও বিরহ বেদনাকে আনন্দে ভরিয়ে দিয়েছে। কখনো ঘোড়া সেজে মেয়েকে পিঠে তুলে নেন। মায়ের পিঠে চড়ে অবুঝ শিশুটি খিল খিল করে হাসে। ছোট্ট সোনার মায়াবি আবদারগুলো তাকে ভালোবাসায় ভরিয়ে রাখে। তাতেও মন ভরে না। জিনিয়া রহমানের ইচ্ছে হয়, যদি পাখি হয়ে ডানা মেলে ওই দূর আকাশে ওকে নিয়ে উড়ে বেড়াতে পারতেন। তাহলে আরও বেশি ভালো লাগত।

আজ তার বাপজানের কথা প্রচণ্ড মনে পড়ছে। জিনিয়া রহমান যখন ছোটো ছিলেন, বাবা তাকে এমনিভাবে আনন্দ দিতেন।। কত বায়না করতেন তিনি। এদিক চলো। ওদিক চলো। এখানে নয়, ওখানে। বাবাকে অস্থির করে তুলতেন। বাবা মেয়ের প্রতি একটুও অখুশি হতেন না। তার প্রতি রাগও দেখাতেন না। আজ বাবা নেই। ঘরটা ফাঁকা। মা-ও চলে গেছেন। ফাঁকা রুমটার দিকে তাকালে জিনিয়া রহমানের মনে পড়ে সেই হারানো স্মৃতিগুলো। আজো যেন বাবা ডাকছেন, আয় রে খুকি! আয় না কাছে। কতদিন দেখি না তোকে। আবেগে অন্তরটা ফেটে পড়ছে তার। আজ তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার সেই প্রিয় বাবা মানুষটি দুনিয়ার বুকে নেই। নেই তার প্রিয় আব্দুর রহমানও।

এসব ভেবে জিনিয়া রহমানের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। ছোট্ট মেয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল মায়ের কান্না দেখে। বলল, মা, আমি তোমাকে কষ্ট দিয়েছি? না, মা, আমি কষ্ট পেয়েছি ঠিকই; কিন্তু তুমি এর কারণ নও। একজন বাবাহারা সন্তানের মায়াবি আহাজারি এ বুকে অশ্রু তুফান বইয়েছে। মমতার জালে যে বাবা আমায় সারাটি জীবন আগলে রেখেছিলেন, আজ সেই বাবাকে আমি মনের আয়নায় খুঁজে পেয়েছি। ভালোবাসার চোখে আমি যে আমার বাবাকে দেখছি। আজ কত যে নিকটে তিনি!

মিসেস জিনিয়া রহমান কম বয়সে স্বামী হারিয়ে এই ছোট্ট শিশুটিকে সঙ্গী করে নিয়েছেন। মা-বাবার বহু অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি জীবন নিয়ে নতুন করে কিছু ভাবতে চাননি। এই নিষ্পাপ শিশুটিকে অসহায় রেখে তিনি নিজের কথা ভাবতে পারবেন না। তিনি কোনোভাবেই এই শিশুকে ছেড়ে যাবেন না। কারো বোঝাও বানাবেন না তাকে।

চোখের সামনে একটু একটু করে মেয়েটি বড়ো হতে থাকল। কবে যে এত বড়ো হলো মা যেন বুঝতেই পারলেন না। জিনিয়া রহমান ভাবছেন, সময় তো এভাবেই বয়ে যায়। জীবনের গতিটাও চলে অবিরাম। ক'জন রাখে জীবনের সেই হিসাব। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় পার হয়ে মেয়েটি এখন বিলেতে। পিএইচডি করছে। আর কিছুদিন বা কিছু মাস। এরপরই ফিরে আসবে সে। মা সেই প্রতীক্ষায় রয়েছেন।

জিনিয়া রহমান এক সময় খুবই সুন্দর চেহারার অধিকারী ছিলেন। সেই জিনিয়া রহমানের আগের অবস্থা আর নেই। বার্ধক্যের ছোঁয়া লেগেছে তার চেহারায়। আগের মতো মনেরও জোর নেই। শরীরটাও তার কথা বোঝে না। রোগ-শোক তাতে বাসা করে নিয়েছে।

মায়ের দিকটা ভেবে ভালো লাগছে না ওয়ানিয়ার। মেয়ে যতবার মাকে ভালো থাকা নিয়ে প্রশ্ন করেছে, জিনিয়া রহমান ততবারই সহাস্যে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি অন্যদের চেয়ে ভালো আছেন। মায়ের কথা শুনে ভালো লাগল তার। চাইলে আসতেও পারছে না সে। মাঝপথে মা-ও এটিকে ভালো চোখে দেখবেন না।

হঠাৎ করে একদিন জিনিয়া রহমান মেয়েকে বললেন, মা, কবে ফিরবে তুমি? ওয়ানিয়া জানাল, আর মাত্র কয়েকটা দিন। বলতে বলতে কেটে যাবে। ওয়ানিয়া বলল, মা, তুমি এ কথা কেন বলছ? আগে কখনো তো এমন করে বলোনি! শরীরটা খারাপ হয়নি তো? তিনি বললেন, অনেক দিন হলো। বড্ড মনে পড়ছে তোমায়।

মনের কথা ডায়েরির পাতায় লিখে রাখতে দারুণ আনন্দ জিনিয়া রহমানের। কত যে ভাবাবেগের কথা জমা আছে তার সেই স্মৃতির পাতায়। স্বামীকে লেখা জীবনের সেই রঙিন মুহূর্তগুলো এখনো তিনি মনের ঘরে আগলে রেখেছেন। মনে পড়লেই এখনো তিনি সেগুলো পড়েন, আর চোখের জলে আঁচল ভিজিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদেন। কলম হাতে বসে গেলেন জিনিয়া রহমান।

মেয়েকে তার কিছু কথা জানিয়ে রাখতে হবে। ডায়েরির শেষ পাতাটি আজকে তিনি খরচ করবেন। হাতে কলম নিয়ে মাথায় হাত ঠেকালেন। লিখতে লাগলেন...

প্রিয় মা আমার,

তোমায় অনেক কিছু বলার ইচ্ছে ছিল। মনে পড়ে আছে অনেক কথা। কিন্তু বলতে পারছি না। তুমি কষ্ট পাবে বলে বুকে চাপিয়ে রেখেছি। আজ যদি

না-বলি, সেটি হবে জীবনের সবথেকে বড়ো অন্যায়। হয়ত এ জনমে তোমার সাথে আমার আর দেখা হবে না। কখনো কেঁদো না আমার জন্য। যদি পারো মায়ের জন্য কিছু ভালো কাজ রেখে যেয়ো। নিজের ভালোর জন্য কখনো অন্যের উপর ছেড়ে দিয়ো না নিজেকে। শেষ বিদায়ে তোমাকে একটি কঠিন সত্য উপহার দিয়ে যাই। যে সত্য আমার হৃদয়ের স্পন্দনকে ছিড়ে দিচ্ছে। তবুও বলতে হচ্ছে, আমি তোমার জন্মদাত্রী মা নই। জানি না, এই কথা শোনার পর তোমার প্রতিক্রিয়া কী হবে! সত্য হলেও, এটি আমার নিজেরই মানতে দারুণ কষ্ট হচ্ছে।

কোনো এক দুর্ঘটনায় তোমার বাবা জনাব আব্দুর রহমান কুঁড়িয়ে পেয়েছেন তোমায়। ওই ঘটনায় তোমার মা-বাবা কেউই জীবিত ছিলেন না। এমনকি তোমার একমাত্র ফুটফুটে ছোটো বোনটিও সেদিন মৃত্যুবরণ করেছে। তোমার জীবন থেকে এই কঠিন সত্যটিকে আড়াল করেছিলাম। তুমি দুঃখ পাবে ভেবে। হয়ত তুমি জানো না, আমি নিজেও ক্যান্সারে আক্রান্ত। তোমায় বলিনি। তুমি মাঝপথে জীবনের লক্ষ্যকে ছেড়ে দাও, তা আমি কখনো চাইনি। পারলে ক্ষমা করে দিও।

ইতি
তোমার মা
জিনিয়া রহমান

এর তিন মাস পর ফিরে এল ড.ওয়ানিয়া। মায়ের লেখা স্মৃতিময় সেই কথাগুলো পড়ছে। আর কান্নার স্রোত বুকে বইছে। জানালার ফাঁক দিয়ে সে এক নাগাড়ে তাকিয়ে আছে গোলাপ বাগিচার কংক্রিটে ঘেরা সেই ছোট্ট সমাধিটির দিকে। যেথায় ঘুমিয়ে আছে, তার সোহাগিনী মা। যে তাকে মানুষ করার জন্য জীবনের চাওয়া-পাওয়া সবই বিসর্জন দিয়েছেন। ড.ওয়ানিয়া ভাবছেন, আর বসে থাকলে চলবে না। মায়ের শেষ ইচ্ছেগুলো পূরণ করতে হবে আমায়। ❑

গবেষক ও শিশুসাহিত্যিক

চড়াচড়ি

কবির মাহমুদ

৯ যেই ৮ কে মারে জোরে চড়
৮ সেই রেগেমেগে করে থরথর।

৮ বলে আমাকে মারলে কেন?
আমি তোর বড়ো ভাই নই যেন তেন!

নয়ের এই কথা শুনে ৮ ও মারে ৭ কে
৭ ও সেই অনুরূপ রেগে বলে ৮ কে।

এই কথা শুনে শুনে ৬ কেও মারে ৭
ছয়েরও চড় খেয়ে ৫ এর গালে হাত।

৫ মারে ৪ কেও, ৩ কেও মারে ৪
সবই সেই একই কথা বলছেই বারবার।

সেই শুনে ৩ ও চড় মারে ২ কে
২ তো মহারেগে বলে দেয় তুই কে?

২ ও সেই রেগে গিয়ে মারে চড় ১ কে
শূন্য তো বলে ওঠে ঘাড় ফিরে দ্যাখ কে?

তবে ১ ভালোবেসে শূন্যের পাশে
বসতেই ০ ও ফাটে উল্লাসে।

দুইজনে মিলে যেই হয়ে গেল ১০,
বাকিরা অবাক চোখে মেনে নিল বস।

গল্প

বই বাড়ি

মাসুম মাহমুদ

তিতলিরা আগে যে পাড়ায় থাকত, সেখানে বাড়ির পাশে একটা ফাস্ট ফুডের দোকান ছিল। নাম বার্গার বাড়ি। সেই বাড়িতে সুস্বাদু বার্গার কিনতে পাওয়া যেত। তিতলি মাঝেমধ্যে বাবা-মায়ের সঙ্গে সেখানে বার্গার খেতে যেত। নতুন পাড়ায় এসে ও একটা বই বাড়ির খোঁজ পেয়েছে। এখানে বিনামূল্যে বই পড়া যায়। পরিবার নিয়ে বিদেশে থাকে একজন দাদুর বাড়ি ওটা। পাড়ার ছোটো-বড়ো সবাই এসে পছন্দের বই পড়তে পারে তাই বাড়ি ভর্তি বই রেখেছেন দাদু। এই বাড়িতে গিয়ে তিতলির অনেক ভালো লেগেছে। দোতলা বাড়ির সবগুলো ঘর জুড়েই রয়েছে হরেক রকম বই। প্রতিটা ঘরের আলাদা আলাদা নাম। হাসির ঘর, রহস্য ঘর, ভূতুড়ে ঘর, কল্পকাহিনি ঘর, বিজ্ঞান ঘর। সবগুলো ঘরে বিষয়ভিত্তিক বড়োদের জন্য যেমন রয়েছে, তেমনি ছোটোদের জন্যও আছে। তিতলির সব থেকে ভালো লাগে প্রকৃতি ও পরিবেশ নামের ঘরটি। ঘরে প্রকৃতি ও পরিবেশ বিষয়ক সব বই রাখা। তিতলি সেখানে বসে বৃষ্টির গল্প পড়ে, নদীর গল্প পড়ে, বনজঙ্গল, গাছপালাসহ আরো কত কী বই পড়ে! যখন ভূতের গল্প বা হাসির গল্প পড়তে মন চায়, অমনি ঘর পালটে ফেলে। ফুড়ুৎ করে ভূতুড়ে ঘরে বা হাসির ঘরে চলে যায়।

বই বাড়ির মালিক, মানে দাদু বিদেশ থেকে মজার মজার চকলেট পাঠায়। প্রতিটি ঘরে ঝুড়ি ভরে সেই চকলেট রাখা থাকে। বাড়ির দেখাশুনার দায়িত্বে যে কাকু রয়েছেন, তাকে বলা আছে ছোটোরা এসে যেন শুধু বই-ই না পড়ে, পড়তে পড়তে চকলেটও যেন খায়। যার যতটা ইচ্ছে ঝুড়ি থেকে চকলেট তুলে খাবে। তিতলি একদিন কাকুকে জিজ্ঞেস করেছিল–কাকু, বার্গার চকলেটও আছে? এ কথা শুনে কাকুর সে কি হাসি! বার্গার চকলেট নামে আবার কোনো চকলেট হয় নাকি!

বই বাড়িতে তিতলির বয়সি অনেকেই ওর বন্ধু হয়েছে। তিতলির বন্ধু বর্ণমালার ভালো লাগে রহস্য ঘর, ফরহাদের কল্পকাহিনি ঘর, সূর্যের ভালো লাগে বিজ্ঞান ঘরটি। ঘরগুলোতে বসে কে কী পড়ল একজন আরেকজনের সাথে সেসব গল্প করে।

বই বাড়িতে আরেকটা জিনিস ভালো লাগে তিতলির। সেটি হলো বাড়ির প্রবেশদ্বারে বিরাট হাসিমুখের একটা

ছবি। কাকু বলেছে ছবিটা এই বাড়ির যিনি মালিক সেই দাদুর। তিতলি মাঝেমধ্যেই ছবিটার দিকে তাকিয়ে ভাবে-দাদুর মনটা অনেক ভালো। এইজন্যই তিনি এত সুন্দর একটা কাজ করতে পেরেছেন। মন মতো বড়ো বাড়িটাতে চাইলে তিনি বই না রেখে ভাড়াও দিতে পারতেন। কিন্তু সেটা করেননি। এসব ভেবে ভেবে দাদুর প্রতি তিতলির অনেক ভালোবাসা জন্মায়। বাড়ির দেখাশোনার দায়িত্বে থাকা কাকুকে তিতলি একবার বলেছিল–ওর খুব ইচ্ছা একদিন দাদুর সাথে গল্প করবে। দাদুকে বলবে বড়ো হয়ে সে নিজেও এমন একটা বাড়ি বানাবে। সেই বাড়িতে দলবেঁধে মানুষ আসবে বই পড়তে। এমন দৃশ্য দেখে তিতলির খুব আনন্দ হবে।

আর কয়েকদিন পরেই বই বাড়ির মালিক, মানে দাদুর জন্মদিন। তিতলিরা সব বন্ধু মিলে ঠিক করেছে জন্মদিনে দাদুকে উপহার দেবে। কিন্তু কী দেবে? অনেক ভেবেও কেউ কোনো কুল-কিনারা পাচ্ছে না। তিতলির হঠাৎ মনে হলো বই দিলে কেমন হয়! বইয়ের থেকে ভালো উপহার তো আর কিছুই হয় না। তিতলির প্রস্তাবটা ওর বন্ধুদের ভালো লাগল। সবাই মিলে ঠিক করল বাড়িতে বাড়িতে ওদের যে বইগুলো পড়া হয়ে গেছে সব দাদুর জন্মদিনে বই বাড়িতে নিয়ে আসবে।

কয়েকদিন যেন দ্রুতই ফুরিয়ে গেল। আজ দাদুর জন্মদিন এবং ঠিকই সবাই আজ যার যার বই নিয়ে বই বাড়িতে এসে হাজির। এসে দেখে এমা! দাদুও বিদেশ থেকে চলে এসেছেন! দাদুকে পেয়ে সবার সে কী আনন্দ! বড়ো বাড়ির বড়ো একজন পাঠক, নাম দয়িতা। তিতলিরা ডাকে দয়িতা আপু বলে। সেও এসেছে ইয়া বড়ো একটা কেক নিয়ে। সবাই মিলে দাদুর জন্মদিনের কেক কাটল। দাদুকে খাইয়ে দিলো, দাদুও সবাইকে খাইয়ে দিল। দয়িতা গান গেয়ে শোনাল। তারপর দাদুর হাতে তুলে দিল সবার জমানো বই। এত এত বই পেয়ে দাদু বললেন, 'দোতলা বাড়িটা বোধ হয় এবার তিনতলা করতে হবে রে। নইলে কোথায় রাখব এত্ত বই!'

তিতলি বলল, 'দাদুকে আমরা আর বিদেশ যেতে দেব না। তিন তলায় একটা ঘর হবে, সেই ঘরে দাদু থাকবে। আমাদের বই পড়ে শোনাবে।' তিতলির কথা শুনে সবাই হো হো করে হেসে উঠল। ❑

গল্পকার

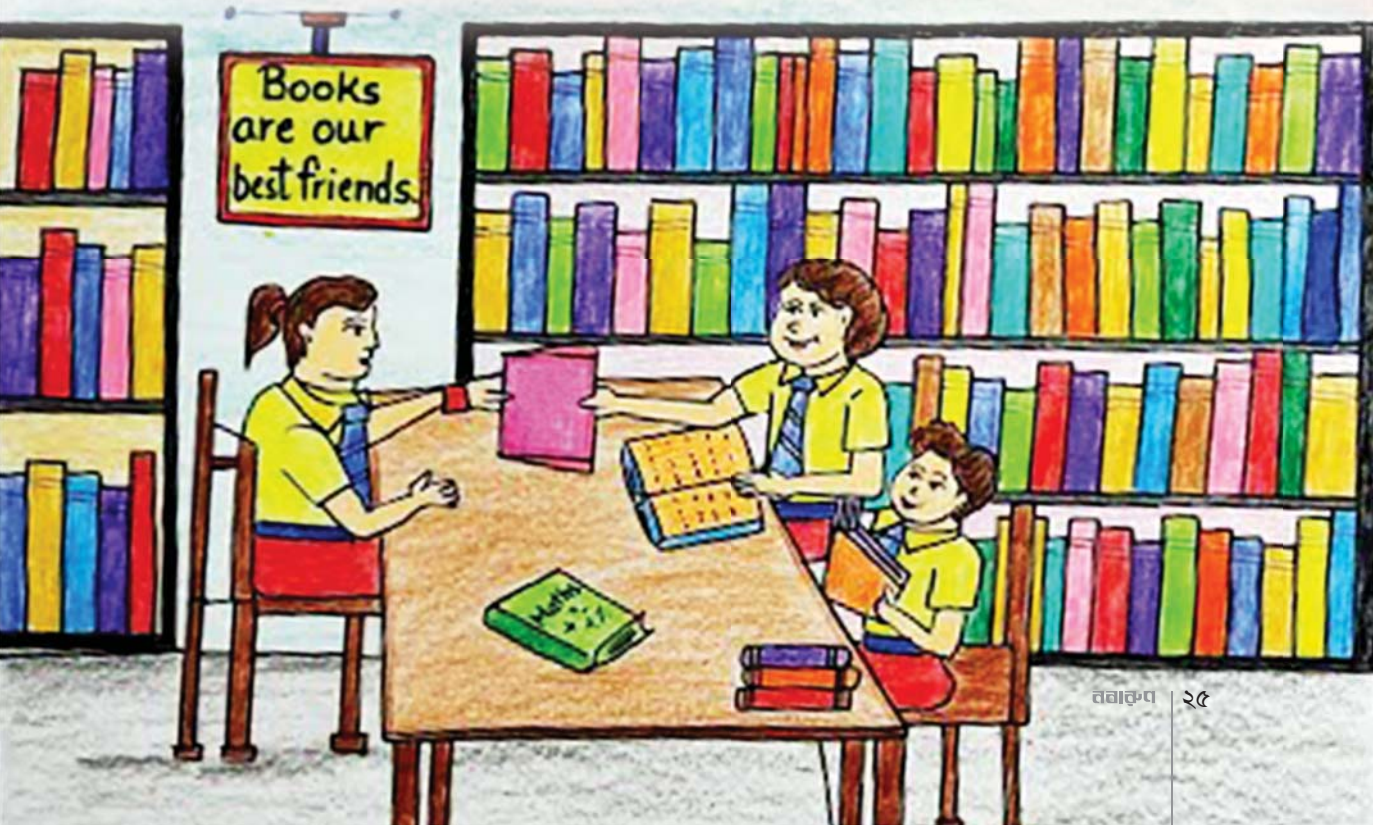

গল্প

রহস্যের সন্ধানে

ইয়াছিন আরাফাত

শীতের গভীর রাত। কুয়াশার চাদরে ঢেকে আছে শহরের অলিগলি। বিখ্যাত গোয়েন্দা আরিয়ান চৌধুরী তার ডায়েরির পাতা উলটে বসে আছেন। হঠাৎ করেই দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। দরজা খুলতেই দেখা গেল, একজন বয়স্ক ভদ্রলোক, চোখে আতঙ্কের ছাপ।

আমাকে বাঁচাতে হবে, চৌধুরী সাহেব! তিনি বললেন। কী হয়েছে? আরিয়ান শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন।

আমার কাছে একটা চিঠি এসেছে। একেবারে অদ্ভুত! কেউ আমাকে মারতে চায়!

চিঠিটা হাতে নিয়ে আরিয়ান দেখতে লাগলেন। কালো কাগজে সাদা অক্ষরে লেখা ছিল:

১৪৪০, পূর্ণিমার রাত, পুরোনো মন্দির। এটাই তোমার শেষ ঠিকানা।

চিঠিতে কোনো স্বাক্ষর নেই। রহস্য ক্রমেই গভীর হচ্ছিল।

পরের দিনই তদন্ত শুরু করেন আরিয়ান। সে শহরের ঐতিহাসিক পুরোনো মন্দিরে পৌঁছালেন। চারপাশে নীরবতা। মন্দিরের ভাঙা অংশে হঠাৎ তার নজরে পড়ল একটা খোদাই করা সংকেত। সেটা এক ধরনের সাংকেতিক ভাষা। তিনি দ্রুত সংকেতটি নিজের খাতায় নকল করলেন।

সংকেতটি ভাঙতে গিয়ে দেখা গেল-

আগুনের সিঁড়ি ধর, যেখানে সময় থেমে আছে।

এটা বুঝতে আরিয়ানের বেশি সময় লাগল না। শহরের পুরনো ঘড়ি টাওয়ার, যেখানে অনেক দিন থেকে ঘড়ির কাটা বন্ধ।

রাতের আঁধারে আরিয়ান ঘড়ি টাওয়ারে গেলেন। সেখানে একটি সিঁড়ি দেখলেন, যা মাটির নিচে নামছে। সিঁড়ি বেয়ে নেমে দেখতে পেলেন একটা ছোটো ঘর। ঘরের দেয়ালে ছিল আরও একটি সংকেত:

সত্যের দরজা খোলার আগে, মিথ্যার জাল ছিড়তে হবে।

ঘরের এক কোণায় একটা ছোটো বাক্স ছিল। খুলতেই ভেতর থেকে বের হলো একটা পুরনো পাণ্ডুলিপি।

পাণ্ডুলিপি পড়ে আরিয়ান বুঝলেন, পুরো ঘটনাটা আসলে এক ধরনের মানসিক খেলা। এই ভদ্রলোকের পূর্বপুরুষেরা বিশাল ধনসম্পদ লুকিয়ে রেখেছিলেন এবং সেই ধনসম্পদের সন্ধান পেতেই একদল অপরাধী এই রহস্যময় সংকেত তৈরি করেছিল।

আরিয়ান সব ঘটনা উন্মোচন করে ভদ্রলোককে সতর্ক করলেন। পুলিশের সহায়তায় অপরাধীদের গ্রেপ্তার করা হলো।

অবশেষে পুরনো মন্দির থেকে উদ্ধার হলো এক সিন্দুকভর্তি ঐতিহাসিক ধনসম্পদ। সেই সম্পদ সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হলো। ❑

গল্পকার

গল্প

ভোম্বল খানের মহাবিপদ

আতিক রহমান

ভোম্বল খান আমাদের পাড়ারই লোক। নামে যেমন ভোম্বল, বুদ্ধিতেও বড্ড বেয়াক্কেল! টিকটিকি, মাকড়সা, তেলাপোকা, আর কুকুরকে সে বড্ড ভয় পায়। একবার ভোম্বল খান তার মামার বাড়িতে বেড়াতে গেল। গায়ে লাল শার্ট। লাল শার্ট তার খুব প্রিয়। কিন্তু শার্টটির ওপরে বেশ ধুলোবালি জমেছিল। তাও সে তার প্রিয় রঙের শার্টটিই পড়ল। তবে তা উলটো করে!

উলটো শার্ট পড়ে ভোম্বল তার মামার বাড়িতে গিয়ে হাজির! কিন্তু তার মামা মামি কেউ বাসায় ছিল না। ছিল শুধু কাজের সাহায্যকারী গোলাপি। গোলাপি এর আগে ভোম্বলকে এ বাড়িতে আসতে দেখেনি।

তাই চিনতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, আপনে কারে চান? ভোম্বল বলল, মোর মামুরে চাই।

গোলাপি বলল, জে না তারা বাসায় নাই। বেড়াইতে গেছেন। কিন্তু সাহেবে কি আপনার আপন মামু?

ভোম্বল দাঁত বের করে হে হে করে হেসে বলল, মোর মার মায়ের পেটের ভাই।

গোলাপি বেশ বুদ্ধিমান মেয়ে। সে ভাবল, ভোম্বলের কথা বিশ্বাস করে তাকে বাড়ির ভেতরে বসতে দেওয়া ঠিক হবে না।

বাসার বাইরে ছিল ছোট্ট একটি পুরোনো ঘর। অনেক দিন কেউ থাকেনি এ ঘরে। তাই ঘরে ভীষণ ধুলোবালি। গোলাপি সেই ঘরেই তাকে বসতে বলল। সেও বসল। বসার একটু পরই একটা টিকটিকি টিকটিক করে উঠল। সে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে ঘরের উপরের দিকে তাকাল। দেখতে পেল, অগণিত মাকড়সা জাল বুনছে। সে আরো বেশি ভয় পেয়ে গেল! তখনি কয়েকটা তেলাপোকা তার পায়ের কাছে উড়ে এল। এবার সে ভয় পেয়ে দিলো এক দৌড়। বাড়ির বাইরে ছিল একটা কুকুর। কুকুরটা তাকে দৌড়াতে দেখে ঘেউ ঘেউ করে তার পিছু নিল। ভোম্বল আরো জোরে দৌড়াতে থাকল। দৌড়াতে দৌড়াতে সে যখন খুব ক্লান্ত, তখন সে বাঁচার জন্য-রাস্তার ইট হাতে নিতে চাইল। কিন্তু ইট তুলতে যেতেই যত বিপত্তি!

ইট এমন শক্তভাবে মাটির সঙ্গে গেঁথে আছে যে, একটি ইটও হাতে তুলতে পারল না ভোম্বল।

একদিকে কুকুরের ভয়, অন্যদিকে ইট তুলতে না পারার জেদে সে মামার এলাকার লোকদের উদ্দেশ্য বকাঝকা শুরু করল। শুনে এলাকার লোকজন ভিড় জমালো। বলল, কী হয়েছে? তুমি আমাদের বকাঝকা করছ কেন? কী দোষ করেছি আমরা?

ভোম্বল রেগে গিয়ে বলল, কী উলটা কামই না কইরা রাখছ তোমরা! বজ্জাত কুকুরগুলারে বাইন্দা রাহার নাম নাই, কিন্তু ইটগুলারে ঠিকই শক্ত কইরা বাইন্দা রাখছ! এ কথা শুনে সবাই হো হো করে হেসে উঠল। ❑

কবি ও গল্পকার

নতুন মলাটের বই

আহনাফ আহমেদ

নতুন বই নতুন মলাট
আছে নতুন ছন্দ
ভালোলাগে, ভালোবাসি
নতুন বইয়ের গন্ধ।

বর্ণ দিয়ে শব্দ বানাই
শব্দ শব্দ খেলা
মনের সুখে ছবি এঁকে
কাটাই সারাবেলা।

[৮ম শ্রেণি, মনিপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজ, কুমিল্লা]

নতুন বই

তুর্ণ রহমান

নতুন বছরে নতুন ক্লাসে
পাবো নতুন বই
নতুন স্যারদের দেখা পাবো
পাবো নতুন বন্ধু, সই।

বই পড়ে বড়ো হব
হবে বড়ো মন
দেশের মুখ উজ্জ্বল করব
এই করেছি পণ।

[৭ম শ্রেণি, মাইলস্টোন স্কুল, উত্তরা, ঢাকা।]

হাতে নতুন বই

মুশফিকা ফারহা

নতুন বই হাতে পেয়ে
দিব পড়ায় মন
মজার সব ছড়া পড়ে
কাটাব সারাক্ষণ।

বইয়ের মাঝে আছে যত
জ্ঞানের আলোয় ভরা
সেই জ্ঞানের আলো দিয়ে
আলোকিত হবে এ ধরা।

[৭ম শ্রেণি, মডার্ন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, কুমিল্লা]

গল্প

কাক ও কাঠবিড়ালি

মামুন সরকার

মাহিম ঢাকার ছেলে। ইন্টার পরীক্ষা দিয়ে গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে গেছে। জন্ম গ্রামে হলেও বাবার চাকরির সুবাদে ঢাকাতে বসবাস। হেমন্তের দুপুর। বাড়ির চারপাশ ঘিরে নানান জাতের বৃক্ষ থাকায় রোদের তাপ তেমন তীব্র না। তাছাড়া হেমন্ত মাস মানেই তো শীতের আগমন। রাতে গাছের পাতা চুইয়ে টিনের চালে টুপটাপ শব্দে শিশির ঝরে। আর তা ভোরের আলোয় ঘাসের ডগায় মুক্তোদানার মতো মনে হয়।

মাহিম বাড়ির উঠোন পেরিয়ে পুকুর পাড়ে এসে শানবাঁধানো ঘাটে বসে। একঝাঁক কাক পুকুর পাড়ে কড়ুই গাছে বসে বিশ্রাম নিচ্ছে। পুকুরের একপাড়ে কাঁঠাল বাগান। অন্যপাড়ে সারিবদ্ধ দেবদারু গাছ। দেখে মনে হয় সুউচ্চ সবুজের দেয়াল। কাঁঠাল বাগানে বেশকিছু কাঠবিড়ালি দৌড়ঝাঁপ করে। আর দেবদারু গাছের ফাঁকফোকরে কিছু বেজির দ্রুত দৌড়ঝাঁপ মাহিমের চোখ এড়ায় না। কাঁঠাল বাগানের কাঠবিড়ালির প্রতি খুব আগ্রহ হয় তার। বিভিন্নভাবে চেষ্টা করে তাদের ধরে আদর করতে। কিন্তু কোনোভাবেই কাঠবিড়ালি মাহিমের ফাঁদে ধরা দেয় না। দূর থেকে মাহিমের কাঠবিড়ালি প্রীতি দেখে ওর বন্ধু মাহবুব বলে, দোস্ত তুমি এমনি ছুটাছুটি করে কোনোদিন কাঠবিড়ালি ধরতে পারবে না। তুমি বরং এক কাজ করো। আমাদের বাসায় ইঁদুর মারার একটা খাঁচা আছে। সেই খাঁচাটা তুমি কাজে লাগাতে পারো।

মাহবুব আর মাহিম এক সাথে ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়েছে। তারপর মাহিম চলে যায় ঢাকাতে। আর মাহবুব এইট পাস করে বাবার সাথে চাষবাসের কাজ করে। মাহিম মাহবুবের কথায় পাত্তা না দিয়ে বলে, ধ্যাত। ইঁদুর মারার কল দিয়ে কাঠবিড়ালি মারব নাকি? ইঁদুরের কলে কাঠবিড়ালি পা দিলে মরে যাবে না! আমি চাই জ্যান্ত কাঠবিড়ালি। যাকে আমি আদর করতে পারব।

মাহবুব বলে, তুমি আমার কথা বুঝতে পারোনি দোস্ত। আমি যে খাঁচাটা দেবো তা ইঁদুর মারার কল নয়। এটা এক ধরনের খাঁচা। বিশেষ কায়দায় বানানো। তুমি পাকা কলা কিংবা পেয়ারা তাতে রেখে কাঁঠাল গাছের কোনো এক ডালে বেঁধে রাখো। খাবারের লোভে কাঠবিড়ালি যদি একবার খাঁচার ভেতরে ঢুকে আর বের হতে পারবে না। লাট্টুর মতো শুধু ঘুরতে থাকব।

মাহিম বলে, ঠিক আছে। তা তোর খাঁচাটা নিয়ে আয় দেখি।

মাহবুব খাঁচা আনতে ভিতরে চলে গেল। মাহিম কাঁঠাল বাগানের ছায়ায় বসে কাঠবিড়ালি আর দেবদারু গাছের ফাঁকফোকরে বেজির দৌড়ঝাঁপের খেলা দেখতে থাকে। বেশ দ্রুত ওদের চলাফেরা। হঠাৎ একটি জায়গায় মাহিমের চোখ আটকে গেল। দেবদারু গাছ থেকে একটি বিষাক্ত সাপ মাটিতে পড়তেই শুরু হয় বেজি আর সাপের লড়াই। সম্ভবত সাপটা কোনো গর্তে ঢুকতে চেয়েছিল। আর সে গর্তে ছিল বেজির বসবাস। বেজির আক্রমণের কাছে সাপটা পরাস্ত হয়। পরাজয় মেনে সাপ পানিতে ঝাঁপ দেয়। পানিতে ঝাঁপ দিয়েও সাপ নিজেকে শেষ রক্ষা করতে পারে না। হঠাৎ কোথা থেকে এক বাজপাখি এসে সাপটিকে পায়ের ধারালো নখে তুলে নেয়। অনেক মোড়ামুড়ি করেও আর ছুটতে পারে না। বাজপাখিটা চোখের পলকে সাপটিকে নিয়ে চলে গেল। যা মাহিমের দেখা ভয়ানক ঘটনা।

বন্ধু মাহবুব ডিম রাখার খাঁচার মতো একটা খাঁচা নিয়ে হাজির হয়। মাহিম বলে, বড্ড দেরি করে ফেলেছিস দোস্ত। আরেকটু আগে এলে সাপ আর বেজির লড়াই দেখতে পারতি।

মাহবুব বলে, সাপ-বেজির খেলা অনেক দেখেছি। নতুন কিছু দেখে থাকলে বল।

হ্যাঁ নতুন কিছু ছিল।

তা নতুন কী দেখেছিস?

বেজির কাছে সাপটা পরাজয় মেনে নিয়ে পানিতে ঝাঁপ দেয়। আর অমনি কোথা থেকে একটা বাজপাখি এসে চোখের পলকে সাপটাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল।

হুম! এমন দৃশ্য আমি কখনো দেখিনি। তবে চিলে মুরগির ছা নিয়ে গেছে এমন ঘটনা আমার চোখের সামনে অনেক ঘটেছে। মুরগির ছা টাকে বাঁচানোর জন্য চিলের পিছু পিছু দৌড়ে কত ঢিল ছুড়েছি। কিন্তু কাজ হয়নি।

তোর মতো আমিও বাজপাখিটাকে একটা ঢিল ছুড়েছি কিন্তু আমার ঢিলটা কোনো কাজে লাগেনি। তা দেখি তোর ইঁদুর মারার কল কেমন।

ইঁদুর মারার কল না দোস্ত। এটা ইঁদুর ধরার যাদুকরী খাঁচা। এই ফাঁদে ইঁদুর মরে না কিন্তু ভিতরে ঢুকলে আর বের হতে পারে না। এক রাতে আট-দশটা ইঁদুর খাবার লোভে ফাঁদে আঁটকে লাট্টুর মতো ঘুরতে থাকে।

মাহবুবের কাছ থেকে লোহার খাঁচাটা হাতে নেয় মাহিম। কিছু সময় নেড়েচেড়ে দেখে। এটা মাছ ধরার

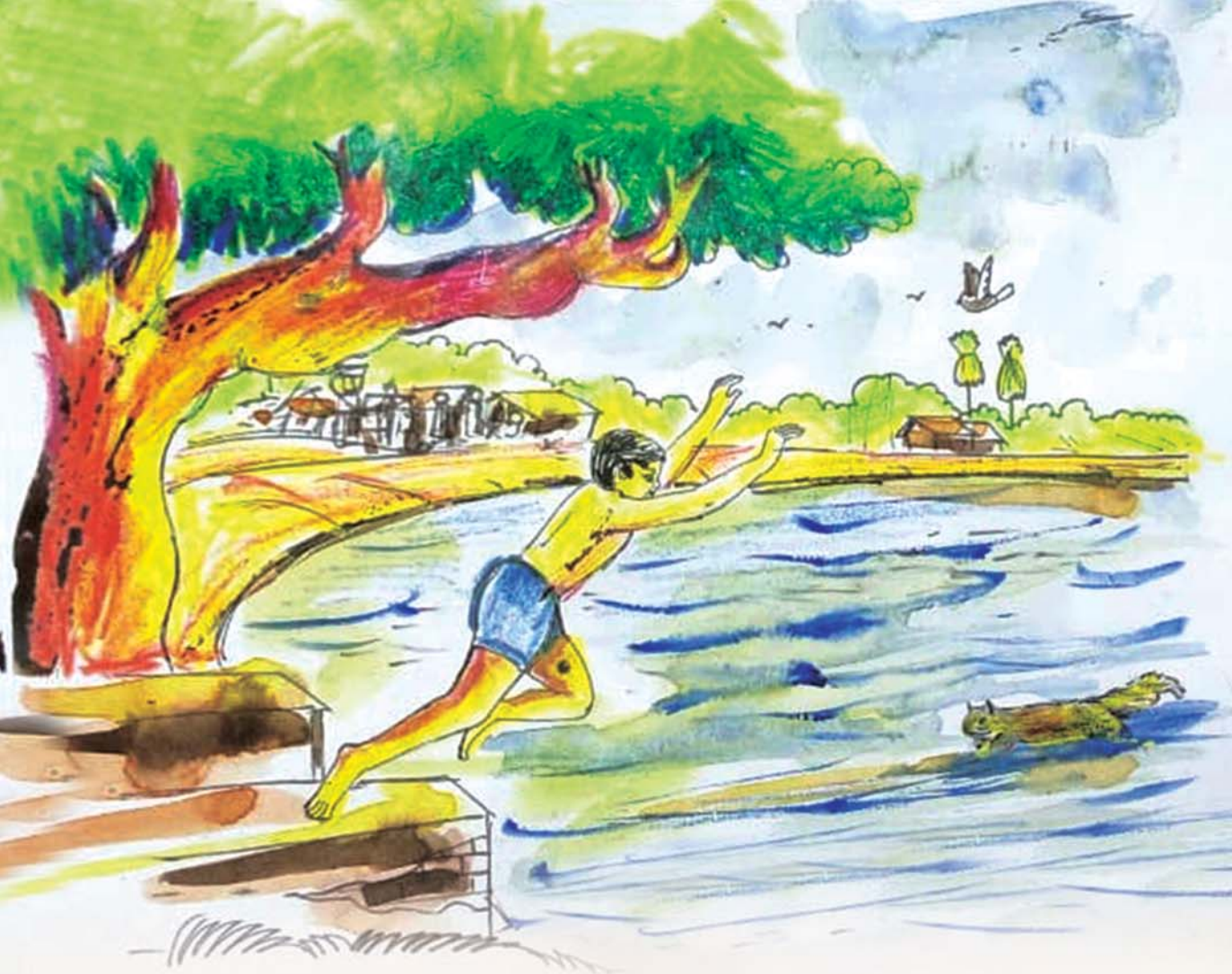

চাঁইয়ের মতো। মাছ যেমন জোয়ারের জলে চাঁইয়ের ভিতরে ঢুকলে আর বের হতে পারে না, ইঁদুরের বেলায়ও ঠিক তাই। মাহবুব খাঁচার সাথে একটা পাকা কলাও নিয়ে এসেছে। কলাটা খাঁচার ভেতর রেখে বলে, আয় কাঁঠাল গাছের কোথাও এটা বেঁধে রাখি। যেখান দিয়ে কাঠবিড়ালি বেশি আনাগোনা করে।

মাহিম মাথা নেড়ে বলে, চল। আমি এগুলো ভালো বুঝি না। তোর যেখানে খুশি বেঁধে দে। দেখি তোর ইঁদুর মারার কলে কাঠবিড়ালি ধরা পড়ে কিনা।

দোস্ত বারবার কেন ভুল করছিস। এটা ইঁদুর মারার কল নয়, ধরার ফাঁদ।

হইল। কল আর ফাঁদ একই কথা।

মাহবুব খাঁচা নিয়ে গাছে উঠতে যাবে এমন সময় কাকের কর্কশ স্বরে এক এলাহি কাণ্ড। কিছু কাক একটা কাঠবিড়ালিকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। কাঠবিড়ালি প্রাণপণে চেষ্টা করছে কাকের ঠোকর থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য। কিন্তু কোনোভাবেই তা পারছে না। এমন দৃশ্য দেখে মাহবুব আর মাহিম তো অবাক। ঘটনা কী হতে পারে তা আঁচ করতে পারে না। কাঠবিড়ালির সাথে কাকের এমন শত্রুতার হেতু কী হতে পারে? কাঁঠাল বাগানের চারদিকে কিছু সময় চোখের চিরুনি অভিযান চালিয়ে মাহিম আবিষ্কার করে কাঁঠাল গাছের মগডালে একটা কাকের বাসা। সম্ভবত ভুল করে কাঠবিড়ালি সেই বাসায় গিয়েছিল। হয়ত বা কাকের বাসায় ডিম কিংবা চোখ ফোটেনি এমন ছা ছিল। মা কাকটা ভেবেছে কিছু চুরির উদ্দেশ্যে কাঠবিড়ালি তার বাসায় ঢুকেছে। আর তাতেই শত্রু ভেবে কাঠবিড়ালির উপর হামলা শুরু করেছে। জানা নেই কাঠবিড়ালি কাকের ডিম কিংবা কাকের ছা খায়

কি-না। কাকের একটা বিষয় মাহিমের খুব ভালো লাগে। তারা মানুষের মতো হিংসুটে নয়। বিপদে সব কাক সংঘবদ্ধ হয় মুহূর্তে। বেচারা কাঠবিড়ালি কাকের অনবরত আক্রমণে একবার গাছে উঠে আবার মাটিতে লাফিয়ে পড়ে। বিশের অধিক কাকের চোখ ফাঁকি দিয়ে নিজেকে কোথাও লুকাতে পারে না। দিশা হারিয়ে কাঁঠাল গাছের ডাল থেকে পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরাতে থাকে। কাকগুলো চারদিক থেকে কাঠবিড়ালিকে ঘিরে ফেলে। গাংচিল যেমন করে মাছ শিকার করে কাকগুলো অনুরূপ কাঠবিড়ালিকে গিলে খেতে চায়। এমন সুন্দর নাদুসনুদুস একটা প্রাণী জলে ডুবে মরবে ভাবতেই মাহিমের গা শিউরে ওঠে। মাহবুবকে কিছু না বলে মাহিম পুকুরে ঝাঁপ দেয়। কাকগুলো কাঠবিড়ালির বদলে মাহিমকে আক্রমণ করার চেষ্টা করে। মাহিমের দেখাদেখি এক কিশোরও পুকুরের নেমে সাঁতরাতে থাকে। কিশোরের হাতে কাক তাড়ানোর জন্য ছোটো একটা লাঠি। পুকুরে নেমে মাহিম সাঁতার কাটতে পারে। শরীর ভারী হওয়ার কারণে ছোটোবেলায় শেখা সাঁতার কোনো কাজে লাগে না। মাহিমের আগেই কিশোর গিয়ে কাঠবিড়ালিটাকে নিয়ে পাড়ে উঠে আসে।

ইতোমধ্যে বেশকিছু লোক জড়ো হয়ে গেছে। কেউ একজন বলে, এমুন আজব কারবার তো কোনোদিন দেখি নাই। কাঠবিড়ালি হইল নিরীহ প্রাণী। কাউয়ার সাথে তার কী নিয়া ঝগড়া বাজল।

যে কিশোর কাঠবিড়ালিটাকে কাকের হাত থেকে বাঁচিয়ে এনেছে সে বলল, ঝগড়া লাগান লাগে নাকি। কাউয়ার ইচ্ছা হইছে এইডারে খাইব। তাই দল বাইন্ধা হামলা চালাইছে। কপাল ভালা মেজবান ভাইছাব পানিত নামছিল। তা না হইলে কাউয়ার ঠুকর খাইয়া ডুইব্বা মরত। আমিও ভাইছাবের দেখাদেখি ঝাঁপ দিছি। ভাইছাব শহরের মানুষ। ভাবলাম যদি সাঁতার না জানে তাই আমি নামছি।

মাহিম কিশোরের মাথার চুলে বিলি কেটে বলে, একদম ঠিক বলেছ। আসলেই আমি সাঁতার জানি না। ছোটোবেলার সাঁতার একদম ভুলে গেছি। পানিতে কোনোভাবেই গা ভাসাতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল আমার পায়ে কেউ পাথর বেঁধে দিয়েছে। তুমি না নামলে আমি ডুবেই মরতাম।

মাহিমের কথা শুনে কিশোর মৃদু হাসল। কাঠবিড়ালিটা মাহিমের হাতে দিয়ে বলে, নেন ভাইছাব। হাতে নেন।

মাহিম কাঠবিড়ালিটা হাতে নিতেই মাহবুব বলে, কেনরে দোস্ত। তুই পানিতে ডুবে গেলে আমি কি বসে থাকতাম না-কি?

মাহিম বলে, তা থাকতি না।

কিছু সময় কাঠবিড়ালিটাকে নেড়েচেড়ে তারপর মাটিতে ছেড়ে দেয়। কিন্তু কাঠবিড়ালিটা তেমন নড়াচড়া করছে না। গায়ের লোমগুলো ভিজে চামড়ার সাথে লেগে গেছে। সাধারণত কাঠবিড়ালি যেভাবে দৌড়ঝাঁপ করে সেই চঞ্চলতা তার মাঝে নেই। সে বড়ো ক্লান্ত। নিঃশ্বাসের সাথে হৃৎপিণ্ডটা উঠানামা করছে আর থেকে থেকে গা কাঁপছে। এর মধ্যে আরো কিছু মানুষ এসে জড়ো হয়। একজন গামছা এগিয়ে দিয়ে বলে, নেন, গামছাডা নেন। গামছা দিয়া সারা গতর মুইছা দেন।

মাহিম গামছা নিয়ে কাঠবিড়ালির সারা গা মুছে দেয়। তারপর কিছু সময় রোদে রাখতেই গা ঝাড়া দিয়ে হাঁটতে থাকে। মাহিম মাহবুবের আনা কলা কাঠবিড়ালির মুখের সামনে তুলে ধরে। সে একটু একটু করে খেতে থাকে। মাহবুব বলে, দোস্ত ঘটনা যাই হোক। তোর ইচ্ছে কিন্তু পূরণ হয়েছে। কোনো এক উছিলায় তুই কাঠবিড়ালিটা পেয়ে গেলি।

মাহিম কিছু বলার আগেই কিশোর চিৎকার করে বলে, ভাইছাব, আপনার কাঠবিড়ালি পালাইয়া যাইতাছে।

মাহবুব আর কিশোর ছেলেটা কাঠবিড়ালির পিছু ছুটে। মাহিম বাধা দিয়ে বলে, দোস্ত ওকে যেতে দে।

মাহবুব থমকে দাঁড়ায়। কিশোর ছেলেটা দৌড়ে ব্যর্থ হয়। সবার চোখের সামনে কাঠবিড়ালিটা খুব দ্রুতবেগে কাঁঠাল গাছে উঠে যায়। মাহিম অবাক বিস্ময়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকে। মনে মনে ভাবে, বন্যপ্রাণী বনেই সুন্দর, খাঁচাতে নয়। ❑

শিশুসাহিত্যিক

মজার তথ্য

নাজমুল হোসেন ফারুক

বই লিখিত বা চিত্রাকারে তথ্য সংরক্ষণের একটি মাধ্যম। যা কাগজের অনেকগুলো পৃষ্ঠা একত্রে বাঁধাই করে তৈরি করা হয় এবং একটি প্রচ্ছদ দ্বারা সুরক্ষিত থাকে। বই এমন একটি মাধ্যম যা যে-কোনো দেশের যে-কোনো ভাষাভাষী মানুষের ব্যবহারের জন্য সমাদৃত। নিজ নিজ মাতৃভাষায় লিখিত রূপের অর্থবহ লেখা বই। সকল বইয়ের ক্ষেত্রেই অক্ষর, সংখ্যা, শব্দ, ব্যাকরণ, বিরাম চিহ্ন, বাক্য, ছবি ইত্যাদি সমন্বয়ে লেখক তার মনের ভাব বইতে লেখা দ্বারা প্রকাশ করে থাকেন। এই বই নিয়ে যেমন তথ্যই হোক না কেন, পড়ুয়াদের কাছে বই নিয়ে বিচিত্র তথ্য সবসময়ই আকর্ষণীয়। বই নিয়ে কিছু মজার তথ্য নবারুণ পাঠকদের জন্য–

পৃথিবীতে বই আছে প্রায় ১৩ কোটি

গুগলের তথ্য মতে, ২০১০ সাল পর্যন্ত ১২ কোটি ৯৮ লাখ বই প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে এই সংখ্যা এখন অনেক বেশি। তাই যে যার নিজের চাহিদা মতো বই সংগ্রহ করে পড়তে পারবে। সংগ্রহ করতে পারবে।

টাইপরাইটারে লেখা প্রথম বই

টাইপরাইটার ব্যবহার করে প্রথম যে বই প্রকাশিত হয়েছে তার নাম 'দ্য অ্যাডভেঞ্চারস অব টম সয়্যার'। এটি প্রকাশ করেছেন মার্ক টোয়েন। তিনি বইটি প্রকাশে অনেক ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন। পুরো বই টাইপ করে টাইপরাইটারে সরাসরি বই লেখা সহজ কাজ ছিল না।

বেশি দামে বিক্রি হওয়া বই

বিজনেস ইনসাইডার জার্নালের তথ্যমতে, এ যাবৎকালের সবচেয়ে বেশি দামে বিক্রি হওয়া বই হলো 'লেওনার্দো দা ভিঞ্চির কোডেক্স লেস্টার'। এটি বিক্রি হয়েছে ৩০ কোটি ৮০ লাখ ডলারে। আর এটি কিনে নেন আরেক বিখ্যাত ধনকুবের বিল গেটস। সবচেয়ে ধনী লোক সবচেয়ে দামি বই কিনবেন, এটাই তো স্বাভাবিক।

পুরোনো বইয়ের গন্ধ নিয়ে শব্দ

পাঠকের মধ্যে অনেকেরই পুরোনো বইয়ের গন্ধ খুব ভালো লাগে। ধুলো, কাগজ আর

বইয়ের আঠার গন্ধ মিলেমিশে যে গন্ধ তৈরি হয় তার নাম হলো 'বিবলিওসমিয়া'। শব্দটির সাথে আমাদের অনেকেরই প্রথম পরিচয় ঘটে।

প্রতিদিন একটি বই পড়তেন যে প্রেসিডেন্ট

আগের রাজা, বাদশাহের নানা রকমের ইচ্ছা ছিল, তেমনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজভেল্ট-এর একটি নেশা হলো শত ব্যস্ততার মাঝেও প্রতিদিন একটি করে বই পড়তেন। তার বই পড়ার সুনাম ছড়িয়েছে পৃথিবী জুড়ে।

বইয়ের প্রচ্ছদে লেখকের নাম নেই

বই প্রকাশের প্রথম দিকে মুদ্রিত বইয়ের প্রচ্ছদে লেখকের নাম ছাপা হতো না। প্রচ্ছদগুলো ছিল ব্যতিক্রমধর্মী। সেগুলো রং-তুলিতে আঁকা, চামড়া দিয়ে বাঁধানো এমনকি সোনায় আচ্ছাদিত ছিল। তাই লেখকের নামের জন্য কোনো জায়গা ছিল না।

মুদ্রিত দীর্ঘতম বাক্য

বার্নস অ্যান্ড নোবেলের মতে, ভিক্টর হুগোর লা মিজারেবলস বইয়ে একটি বাক্য আছে, যেটিতে রয়েছে ৮২৩ শব্দ। বইটিতে জায়গার অভাবে বাক্যটি ছাপানো হয়নি।

নিরক্ষরতা বিশ্বের একটি বড়ো সমস্যা

পৃথিবীতে বয়স্ক মানুষদের মধ্যে একজন পড়তে বা লিখতে জানে না। দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়া এবং সাব-সাহারান আফ্রিকায় নিরক্ষর ব্যক্তির হার সবচেয়ে বেশি।

আইসল্যান্ডের মানুষ সবচেয়ে বেশি পড়ুয়া

পৃথিবীতে এমন একটি দ্বীপ আছে যেখানকার মানুষেরা সবচেয়ে বেশি বই পড়ে। বই পড়ার সঙ্গে রয়েছে আবহাওয়ার সম্পর্ক। এখানে সব সময় আবহাওয়া ঠান্ডা থাকে। তারা এ ঠান্ডার কারণে ঘরে বসে বই পড়তে খুব ভালোবাসে। ❑

প্রাবন্ধিক

বই নিয়ে মনীষীদের উক্তি

আশরাফুল আলম

বই হলো এমন একটি উপকরণ, যা একজন মানুষকে সহজেই আলোকিত করে তুলতে পারে। জ্ঞান, শিক্ষার আলো, নীতি-নৈতিকতা-আদর্শ, ইতিহাস-ঐতিহ্য, কৃষ্টি-সভ্যতা, সাহিত্য-সংস্কৃতিসহ সবকিছুই রয়েছে বইয়ের ভেতরে। বই আমাদের বন্ধু, শিক্ষক এবং অভিভাবকদের মতো ভূমিকা রাখে । মানুষের ভিতরের অন্ধকারকে দূর করে আলোকিত জীবন, সমাজ, দেশ গঠনে বই হলো সেরা হাতিয়ার। আধুনিক বিশ্বকে জানতে বইয়ের বিকল্প নেই । বই মানুষের মনের দুয়ার খুলে দিয়ে চিন্তার জগতকে প্রসারিত করে। প্রতিটি সফল মানুষের সফলতার পিছনে রয়েছে বইয়ের ভুমিকা। তারা নিয়মিত বই পড়তেন। ওয়ারেন বাফেট পেশাগত জীবনের শুরুতে প্রতিদিন ৬০০ থেকে ১০০০ পৃষ্ঠা বই নিয়মিত পড়তেন। বিখ্যাত ধনকুবের বিলগেটস প্রতিবছর ৫০টি বই পড়েন। বই পড়লে মানুষের মন প্রফুল্ল হয়। বই পড়া নিয়ে বিখ্যাত কিছু উক্তি নিয়ে এবারের আয়োজন–

১. 'বই পড়াকে যথার্থ হিসেবে যে সঙ্গী করে নিতে পারে,তার জীবনের দুঃখ কষ্টের বোঝা অনেক কমে যায়'।–শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২. 'বই কিনে কেউ কোনোদিন দেউলিয়া হয় না'।–সৈয়দ মুজতবা আলী

৩. 'জীবনে তিনটি জিনিসের প্রয়োজন- বই, বই এবং বই'।– ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

৪. ‘ঘরের কোনো আসবাবপত্র বইয়ের মতো সুন্দর নয়’।–সিডনি স্মিথ

৫. ‘বই হচ্ছে মস্তিষ্কের সন্তান’।–জনাথন সুইফট

৬. ‘বই একটি অনন্য বহনযোগ্য যাদু’।– স্টিফেন কিং

৭. ‘একটি বই একটি স্বপ্ন যা আপনি আপনার হাতে ধরে রাখেন’।– নিল গাইমান

৮. ‘একটি ভালো বই হলো বর্তমান ও চিরকালের জন্য সবচেয়ে উৎকৃষ্ট বন্ধু’।–টুপার

৯. ‘অন্তত ষাট হাজার বই সঙ্গে না থাকলে জীবন অচল’।– নেপোলিয়ান

১০. ‘ভালো বই পড়া মানে গত শতাব্দীর সেরা মানুষদের সাথে কথা বলা’।– দেকার্তে

১১. ‘বই পোড়ানোর চেয়েও গুরুতর অপরাধ অনেক আছে। সেগুলোর মধ্যে একটি হলো বই না পড়া।’–জোসেফ ব্রডস্কি

১২. ‘একটি ভালো বইয়ের কখনোই শেষ বলতে কিছু থাকে না’।– আর ডি কামিং

১৩. ‘ভালো খাদ্যবস্তু পেট ভরে কিন্ত ভালো বই মানুষের আত্মাকে পরিতৃপ্ত করে’।–স্পিনোজা

১৪. ‘বই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ আত্মীয়, যার সঙ্গে কোনোদিন ঝগড়া হয় না, কোনোদিন মনোমালিন্য হয় না’।– প্রতিভা বসু

১৫. ‘বই খুলে যা দেখে নেয়া যায় তা কখনো মুখস্থ করতে যেয়ো না’।–আলবার্ট আইনস্টাইন

১৬. ‘একটি বই পড়ার দুটি উদ্দেশ্য থাকা উচিত একটি হলো, বইটিকে উপভোগ করা অন্যটি হলো, বইটি নিয়ে গর্ব করতে পারা’।– বার্ট্রান্ড রাসেল

১৭. ‘বই হলো এমন এক মৌমাছি যা অন্যদের সুন্দর মন থেকে মধু সংগ্রহ করে পাঠকের জন্য নিয়ে আসে’।– জেমস রাসেল

১৮. ‘আমরা যখন বই সংগ্রহ করি, তখন আমরা আনন্দকেই সংগ্রহ করি’।– ভিনসেন্ট স্টারেট

১৯. ‘বই পড়ার অভ্যাস নেই আর পড়তে জানে না এমন লোকের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই’।– মার্ক টোয়েইন

২০. ‘গৃহের কোনো আসবাবপত্র বইয়ের মতো সুন্দর নয়’।– সিডনি স্মিথ

২১. ‘আপনি যখন পড়া শিখবেন তখন আপনার আবার জন্ম হবে এবং আপনি আর কখনও একা থাকবেন না’। – রুমার গডডেন

বন্ধুরা, প্রতিটি পুরস্কার হোক বই। প্রতিটি উপহারের বিকল্প হোক বই। তবেই আমাদের জীবন হবে সুন্দর। বই এমন একটি উপকরণ যা পড়ার পর যত্ন করে সাজিয়ে রাখা যায়। প্রজন্মের পর প্রজন্ম চাইলে সেই বই পড়তে পারে। তাই এসো আমরা বইকে ভালোবাসি এবং বই পড়ি।

বারবি ডলের কথা

এম. আতিকুল ইসলাম

বন্ধুরা, তোমাদের অনেকেরই প্রিয় পুতুল বারবি ডল। দেখতে অত্যন্ত আদুরে এই পুতুলটি সারা বিশ্বেই সমান জনপ্রিয়। আজ জানব এ পুতুলের ইতিহাস ।

সময়টা হলো ১৯৫০ সাল। মার্কিন নাগরিক রুথ হ্যান্ডলার লক্ষ্য করলেন তার কন্যা বারবারা হ্যান্ডলার ও তার বন্ধুরা সাধারণ ছোটো পুতুলের চেয়ে পূর্ণবয়স্ক পুতুল নিয়ে খেলতেই বেশি আগ্রহী। রুথের মনে হলো ছোটো মেয়েরা বেবি পুতুলের যত্ন নেওয়ার চাইতে পুতুলের মাঝে নিজেদের 'বেড়ে উঠার ইমেজ' আবিষ্কারেই বেশি আগ্রহী। রুথ চাইলেন থ্রি ডাইমেনসনাল বা ত্রিমাত্রিক পুতুল বানিয়ে মেয়ের কল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে। তিনি তার পরিকল্পনার কথা বারবারার

বাবাকে জানালেন। এলিয়ট হ্যান্ডলার ছিলেন মেটাল করপোরেশনের মালিক। স্ত্রীর আবদার রাখতে তিনি করপোরেশন কমিটির সভা ডাকলেন। উদ্দেশ্য এ ধরনের কোনো পুতুল বানানো যায় কিনা; কিন্তু কমিটির সদস্যরা অধিক খরচের অজুহাতে রাজি হলেন না। কিছুদিন পর রুথ ইউরোপ থেকে ফেরার পথে সাথে করে নিয়ে এলেন 'লিলি' নামের এক পুতুল, যা বানানো হয় জার্মানিতে, এক জনপ্রিয় কমিক চরিত্রের আদলে। লিলিকে নিয়ে পর্যবেক্ষণ শুরু করলেন রুথ। একজন ডিজাইনার নিয়োগ দিলেন এরকম একটা পুতুল তৈরির জন্য। অবশেষে তৈরি হয়ে যাওয়ার পর মেয়ে বারবারার নামানুসারে এই পুতুলের নাম দিলেন 'বারবি ডল'।

বোর্ডে অনুমোদনের পর মেটাল করপোরেশন বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এ পুতুল বানানো শুরু করল। ১৯৫৯ সালে নিউইয়র্ক শহরে অনুষ্ঠিত 'আমেরিকান টয় ফেয়ার'-এ প্রথমবারের মতো আত্মপ্রকাশ করে বারবি ডল। প্রথমবারেই বিক্রি হলো তিন লাখ একান্ন হাজার পুতুল। ছোটো বড়ো সকলের কাছেই রয়েছে এর কদর। সাড়ে ১১ ইঞ্চি দীর্ঘ, সুন্দর লম্বা পা, উজ্জ্বল বাদামি চোখের বারবি ডলের চুলের ডিজাইন এবং মুগ্ধ করা উজ্জ্বল পোশাক সবার মন কেড়ে নেয় সহজেই। বারবি পুতুল বিভিন্ন পেশার মেয়েদের অবয়বে তৈরি হয়ে বাজারে আসে। যেমন : টিভি সংবাদ পাঠিকা, হলিউডের নামিদামি অভিনেত্রীদের আদলে, নার্স, চিকিৎসক, মহাকাশযাত্রী, দমকল কর্মী, বিদ্যালয় পড়ুয়া বালিকা, এমনকি প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসেবেও অবতীর্ণ হচ্ছে এই ডল! তবে এর চোখের রং এবং আকারের কোনো পরিবর্তন হয় না । ❑

সহকারি ম্যানেজার, মাইক্রো ফাইবার গ্রুপ

গল্প

গুলতিবাজ

মাসুম বিল্লাহ

আমার নাম রাশা।

দুইটা নামের প্রথম অক্ষর নিয়ে রাশা।

আমি পড়ি ক্লাস সিক্সে।

স্কুলের নামটাও তোমাদের জানিয়ে দিলাম বিদ্যানন্দন হাই স্কুল। ইংরেজি-বাংলা মিশিয়ে নাম।

কিন্তু আমার রোল নম্বর আর শাখার নাম বলছি না। দেখা যাবে তোমরা খুঁজতে খুঁজতে ঠিক হাজির হয়ে গেছ। তখন দুষ্টচক্র আমার খোঁজ পেয়ে যাবে আর আমি ভয়ংকর বিপদে পড়ে যাবো। এই ঝুঁকিটা নেওয়া ঠিক হবে না।

আমি মা-বাবার সঙ্গে শহরে থাকি।

এবার আমি তোমাদের আমার গুলতিবিষয়ক গল্পটা বলব।

আমি জানি, এই কাহিনিটা শুনে তোমরা কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না। কেউ কেউ বলে ফেলতে পারো- এই ছেলে পুরো গুল মারছে! কিন্তু ডিয়ার ফ্রেন্ডস, বিলিভ ইট অর নট- আমি গুলতি নিয়ে মোটেও গুল মারছি না।

'গুলতি' হুম, গুলতি হলো—

উফ্, আমিও গুলতি কী তা প্রথমে চিনতাম না, জানতাম না। আমাকে শিখিয়েছে জুলফিকার। অবশ্য সবাই ওকে 'জুলফি কিংবা জুলফি গুলতিবাজ' বলে ডাকলেও আমি 'জুলফিকার' বলেই ডাকি। আমি দেখেছি এতে ও খুশি হয়। আমারও মনে হয়, কারোর নাম নিয়ে কাটাছেঁড়া করা উচিত নয়। কেউ কেউ মনে মনে কষ্ট পায়। জুলফিকার আমার এক ক্লাস নিচে পড়ে, ক্লাস ফাইভে। আমি ওকে কখনও 'ওস্তাদ', কখনও 'গুরু' বলেও ডাকি।

জুলফিকার অবশ্য মজা করে বলেছিল, 'গুরু যা গরুও তা'!

ওর এই কথায় আমি খুব মজা পেয়েছিলাম।

তো যা বলছিলাম- জুলফিকারই প্রথম আমাকে গুলতি চিনিয়েছে, গাছে চড়তে শিখিয়েছে, এমনকি সাঁতারও শেখা ওর কারণে...

ভাগ্যিস, এইবারের ঈদের ছুটিতে গ্রামে বেড়াতে এসেছিলাম! আমার মায়ের বাবার বাড়ি। মানে আমার নানাবাড়ি। গ্রামের নাম মধুপুর। গ্রাম ছুঁয়ে আত্রাই নদী। ছোটো মামা বললেন, 'ভাগনে, চল, নদীতে গোসল করে আসি।'

আমিও খুশির চোটে নাচতে নাচতে চলে এসেছি।

ওখানে বসেই প্রথম জুলফিকারের সঙ্গে দেখা এবং পরিচয়।

ছোটো মামা নদীতে নেমে পড়লেন। পর পর দুটো ডুব দিলেন। অনেকদূর পর্যন্ত সাঁতার কাটলেন।

কিন্তু আমি ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম নদীর পাড়ে!

ছোটো মামা হাতের ইশারায় ডাকলেন, 'নেমে পড়।'

আমি কাঁচুমাচু হয়ে মাথা নেড়ে 'না' বললাম। মনে মনে বলি, 'চাইলেই কী আর নেমে পড়া যায়, মামা!'

ছোটো-ছোটো ছেলে-মেয়েরাও তুমুল সাঁতার কাটছে। একজন আরেকজনের সাথে দুষ্টুমিতে মত্ত। ওদের সবার চোখ টকটকে লাল। তারপরও ওরা পানি থেকে যেন উঠতেই চাইছে না। পিচ্চি পিচ্চি ছেলে-মেয়েদের বেজায় সাহস। গ্রামে থাকার এই এক সুবিধে ওরা ছোটো থাকতেই সাঁতার শিখে যায়, তরতর করে গাছে চড়তে শেখে, মাছ ধরতে পারে, কেউ কেউ আবার মাঠেও কাজ করে...। আর আমরা যারা শহরে থাকি তারা এক একটা ভিতুর ডিম। আমার বাবা বলেন- 'ফার্মের মুরগি'! আমি নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে যখন এসব ভাবছি তখন হঠাৎ জুলফিকার পানি থেকে উঠে এসে আমার সামনে দাঁড়ালো। হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আসো, আমরা একসাথে সাঁতার কাটপানি।'

আমি বলি, 'না, না, আমি সাঁতার জানি না।'

'আমি তোমারে পাঁচ মিনিটে সাঁতার শিখাইয়ে দিবানি।'

এরপর জুলফিকার ঠিক বড়ো ভাইয়ের মতো আমার হাত ধরে নদীতে নামালো। ভয়ের চোটে আমি চোখ বন্ধ করে ফেলি। এক ফাঁকে দেখলাম ছোটো মামা মুখ টিপে হাসছেন। সেইসময় আমার কী যে লজ্জা লাগছিল!

সত্যি সত্যি জুলফিকার আমাকে পাঁচ মিনিটের ভেতর একপ্রকার সাঁতার শিখিয়ে ছাড়ল।

কী অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে?

জানি হচ্ছে।

প্রথমে আমারও যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। যখন দেখলাম আমি সাঁতার কাটতে পারছি, তখন আমারও মনে হয়েছিল সাঁতার শেখা খুব সহজ! যদি জুলফিকার কোচ হয়।

সেদিন বিকেলে আবারও জুলফিকারের সঙ্গে ঘুরতে বের হলাম। একটা ঘন বনের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে জুলফিকারকে প্রশ্ন করলাম, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

আমরা একটা খোলা মাঠ পেরিয়ে এলাম। এরপরই একটা ঘন জঙ্গল। আমার কেমন ভয় ভয় লাগল। হঠাৎ জুলফিকার আমাকে পেছনে রেখে পা টিপে টিপে সামনে এগিয়ে গেল। পেছনে ফিরে ইশারায় আমাকে শব্দ করতে নিষেধ করল। ডান পকেট থেকে বের করল গুলতি আর বাঁ পকেট থেকে এঁটেল মাটির গুলি। তারপর এক চোখ বন্ধ করে টিপ ঠিক করে।

জুলফিকার হাসি হাসি মুখ করে বলল, 'চলো, আজকে তোমারে নিয়ে 'পাখি শিকার' করতি যাবো।'

'মানে?'

'গেলেই দেখতে পাবে।'

আমি পেছন থেকে ওর পিঠে একটা খোঁচা দিলাম। ও ফিরে বিরক্তি ও জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়।

আমি বললাম, 'কী করছ তুমি?'

'এখুনি দেখতে পাবে শহুরে বাবু!' জুলফিকার বেশ ভাবের সঙ্গে বলল।

জুলফিকার একটা ছাতিম গাছের পাতার ফাঁকে তার গুলতি তাক করল। এক মুহূর্তে একটু দূরে মাটিতে ধপাস শব্দ হলো। জুলফিকার দৌড়ে গেল। আমিও ছুটে যাই। গিয়ে যে দৃশ্য আমি দেখতে পেলাম তা আমি স্বপ্নেও দেখতে চাই না। সেই আমার সামনেই কিনা একটা নাম না-জানা পাখিকে মাটিতে পড়ে ছটফট করতে করতে পাখিটার মৃত্যু হলো।

আমি ঘৃণাভরে জুলফিকারের চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'এটা তুমি কী করেছ, দেখো!'

'পাখি শিকার।' নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল জুলফিকার। যেন কিছুই ঘটেনি।

আমি দৃঢ়কণ্ঠে বললাম, 'ওটা পাখি শিকার হবে না, ওটা হবে 'পাখি মারা'। যাকে বলে ঠান্ডা মাথায় মারা।'

জুলফিকার আকাশ থেকে পড়ল। ওর মুখ হাঁ হয়ে গেল। কী বলবে- ভেবে পাচ্ছে না। শূন্য চোখে মাটিতে পড়ে থাকা মৃত পাখিটার দিকে চেয়ে আছে।

এই প্রথম আমি গুলতি দেখলাম। দেখলাম গুলতি দিয়ে কীভাবে একটা পাখিকে মারা হলো। অবশ্য এর আগে ছোটো মামার কাছে গুলতি নিয়ে তার ছোটোবেলার গল্প শুনেছিলাম।

কিছু সময় পর আমি জুলফিকারকে বলি, 'থাক, হয়েছে, আর মন খারাপ করে থেকো না।'

আমি ওর হাত থেকে গুলতিটা নিয়ে বললাম, 'ধরো, এটা একটা বন্দুক। এটাতে একটা গুলিও আছে...।'

জুলফিকার এবার কথা খুঁজে পেল। দ্রুত বলল, 'গুলতি আবার বন্দুক হয় নাকি?'

'এটা দিয়েই তুমি এইমাত্র পাখিটাকে মেরে ফেললে না?'

'হু।' জুলফিকার মাথা নাড়ল।

'তাহলে এটা একটা বন্দুক। ব্যস।'

'বুঝতি পারিছি...।'

'মনে করো, এই বন্দুকটা দিয়ে তোমাকে আমি গুলি করে মেরে ফেললাম।'

'কী?' ভয় পেয়ে আঁতকে উঠল জুলফিকার।

'ভয় পেও না, ভয় পেও না, তোমায় আমি মারব না...।' হাসলাম আমি।

'তারপর?' ঢোক গিলল জুলফিকার।

'তারপর... সন্ধে হয়ে রাত নামল এই বনের ভেতর, বাড়ির সবাই তোমাকে খুঁজতে খুঁজতে এই এখানে চলে এল... তোমাকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে তোমার মা-বাবার সে কী কান্না...!'

চিৎকার করে উঠল জুলফিকার, 'থামো, থামো, আর না...।'

'আর পাখি মারবে?'

'মানুষ আর পাখি কী এক কথা...?' এখনও জুলফিকার দোনোমোনো করছে।

'কেন এক হবে না ওস্তাদ? অবশ্যই এক। তোমার প্রাণ আছে, পাখিরও প্রাণ আছে। তোমার ঘর আছে, পাখির আছে বাসা, তোমার মা-বাবা আছে, পাখিরও আছে... কী আছে কিনা?'

'তা আছে, কিন্তু...।' মাথা চুলকাতে লাগল জুলফিকার।

আমি বললাম, 'যেমন ধরো, এটা একটা মা পাখি, বাচ্চাদের জন্য খাবার খুঁজতে বের হয়েছিল, আর তুমি মা পাখিটাকে গুলতি দিয়ে মেরে ফেললে! এখন ওই ছোটো-ছোটো বাচ্চাগুলোর কী অবস্থা হবে বলো?'

জুলফিকার চুপ। মুখে কথা নেই।

হঠাৎ সে গুলতিটা দূরে ছুড়ে মারল।

আমি বললাম, 'আমার ওপর রাগ করলে?'

'না বন্ধু। আমি আর কোনোদিনও পাখি শিকার করব না...'

আমি জুলফিকারকে জড়িয়ে ধরলাম।

এই সময় চারপাশে শত শত পাখির কিচিরমিচির শুনতে পেলাম আমরা... ❑

শিশুসাহিত্যিক

গল্প

কৌশল

আঞ্জুমন আরা

এক বনে বাস করত একদল মৌমাছি। তারা সবাই মিলে বনে ঘুরেঘুরে মধু সংগ্রহ করত এবং তা মৌচাকে জমা করত। এজন্য তাদের সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হতো। মৌমাছির গুণগুণ গুঞ্জনে মুখরিত থাকত সারা বন। এই গুঞ্জন পৌঁছে যেতো বনের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। সেই বনে বাস করত এক কোকিল। সে ছিল বড্ড অলস। এমনিতেও কোকিল সারা বছর বনে বনে ঘুরে বেড়ায়। নিজের জন্য

একটা বাসাও তৈরি করে না। বরং ডিম পাড়ার সময় হলে কাক অথবা অন্য কোনো পাখির বাসায় ডিম পাড়ে। একদিন কোকিলটি বড়ো গাছের মগডালে বসে কুহুকুহু সুরে গান করছিল। এবং মনে মনে ভাবছিল–

আমি হলাম অত্যন্ত গুণী একটি পাখি। কত মিষ্টি আমার গলার সুর। কতইনা মধুর সুরে আমি গান করি। মানুষ আমার গানের কত প্রশংসা করে। গুণী শিল্পীকে তারা কোকিলকণ্ঠী বলে আমার সাথে তুলনা করে।

নিজের প্রশংসায় গদগদ হয়ে কোকিল যখন দূরে তাকালো তখন দেখতে পেলো বনের মাঝে ধোয়া উড়ছে। কোকিল তার গান বন্ধ করে জলদি সেখানে উপস্থিত হলো এবং দেখতে পেলো, কতগুলো লোকের হাতে মশালের মতো কিছু একটা। যা দিয়ে তারা মৌচাকের চারিদিকে ধোয়া সৃষ্টি করে মৌমাছি তাড়াচ্ছে, এবং তাদের এত পরিশ্রমের ফসল মৌচাক কেটেকেটে পাত্রে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। চোখ মুখ বাঁধা লোকগুলো বড্ড ভয়ংকর লাগল কোকিলের কাছে। পাগলপারা মৌমাছির জন্য কোকিলের মনটা খুব খারাপ হয়ে গেলো। সেদিন আর সে গান করল না। গাছের ডালে চুপ করে বসে রইল।

লোকগুলো চাকসহ মধু নিয়ে চলে যাওয়ার পর কোকিল আহত মৌমাছিদের কাছে গেল এবং তাদের বলল–

আচ্ছা, তোমরা এত কষ্ট করে মৌচাক বানাও। কত পরিশ্রম করে মধু সংগ্রহ করে জমা করো। সেই মধু এভাবে মানুষ চাকসহ কেটে নিয়ে যায়, তোমাদের দুঃখ লাগে না?

জবাবে মৌমাছির রানি বলল–

মানুষ কত বোকা জানো? আমাদের তৈরিকৃত চাক ও মধু নিয়ে যায় এবং সহজে আমাদের পরিশ্রমের ফসল ভোগ করে। কিন্তু ওরা আমাদের পরিশ্রমের কৌশল নিতে পারে না। আমরা সুনিপূণ কৌশল জানি বলে মধু সংগ্রহ করতে পারি। কেউ যদি আমাদের মধুর প্রতি লোভ না করে আমাদের জীবনযাপনের কৌশল ও নিয়মনীতি অনুসরণ করত তাহলে তাদের জীবনও সুন্দর হতো। তারা সুখী হতো এবং অধিক সম্পদশালী হতে পারত।

কোকিল তখন মাথা নীচু করে মাটির দিকে তাকিয়ে আছে। আর মনে মনে ভাবছে---

আসলেই মৌমাছিরা সংঘবদ্ধ হয়ে কত কঠিন একটি কাজ সম্পাদন করে। আর আমরা সুকণ্ঠি হয়েও নিজের জন্য একটি বাসা পর্যন্ত বানাই না। অপরের বাসায় ডিম পেরে আমাদের বাচ্চা পালন করাই। আমরাও যদি পরের অর্জনে লোভ ও হিংসা না করে মৌমাছির জীবন থেকে অর্জনের কৌশল শিখে নিয়ে নিজেদের জীবন সাজাতাম তাহলে আমাদের কেউ লোভী অথবা স্বার্থপর বলে আখ্যা দিত না। বরং আমাদেরও পরিশ্রমী হিসেবে প্রশংসা করত। ❑

শিশুসাহিত্যিক

গল্প

চাঁদনি দাদু

গাজী আরিফ মান্নান

সেদিন বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় মা চাচিরা বাড়ির উঠোনে পাটি বিছিয়ে বসে বসে গল্প করছে, প্রীতিও তখন তাদের সঙ্গে একপাশে বসে ছিল। বড়োরা সবাই মিলে গল্প করছে, তার বয়েসি কেউ না থাকায় সে কারো সঙ্গে কথা বলতে পারছে না! তাই পাটিতে বসে খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। সে দেখল হাজার হাজার তারার মাঝে ফকফকা গোলাকৃতির চাঁদটা। প্রীতি দেখল চাঁদটা সন্ধ্যাবেলার নিকষ অন্ধকার দূর করে কি সুন্দর করে আলো ছড়াচ্ছে। মনে হচ্ছে আকাশপানে চাঁদটা বুঝি খিলখিলিয়ে হাসছে। চাঁদের ভিতর একটা কুঁজো বুড়ি বসে বসে যেন চরকা কাটছে। বুড়ির আশপাশে কিংবা সামনে পিছনে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। প্রীতি মনে মনে চিন্তা করে ইশ! আমি যদি চাঁদের ওই বুড়ির কাছে যেতে পারতাম, তবে অনেক মজা হতো।

কিছুক্ষণ পর চাঁদের বুড়ি প্রীতির কাছে একটা দূত পাঠিয়ে দিল। দূতটি এসে প্রীতিকে বলল তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নাও, তোমাকে আমি চাঁদের বুড়ির কাছে নিয়ে যাব। তখন প্রীতি বলল কিন্তু তুমি কে? আমি তো চিনলাম না! তখন সে বলল আমি চাঁদের বুড়ির পাঠানো দূত। প্রীতি বলল কিন্তু তুমি কেন এসেছ?

দূতটি বলল চাঁদের বুড়ি সবার মনের খবর রাখে, তখন সে বলল আমি তো তাকে কিছুই বলিনি! দূতটি বলল চাঁদের বুড়ি আমাকে বলল তোমার নাকি তার কাছে যেতে মন চাইছে, তাই আমাকে পাঠিয়েছে। প্রীতি বলল কিন্তু এখান থেকে এত দূরের চাঁদের বুড়ি তা কীভাবে বুঝল? দূতটি বলল, বুড়ি চাঁদের ভেতর থাকলেও সে সবার মনের কথা বুঝতে পারে! চাঁদের বুড়ির কাছে যাদু আছে, চাঁদে বসে সে সব কিছুই করতে পারে। দূতটির কথা শুনে প্রীতি বলল ঠিক আছে আমি যাব, এরপর দূতটি প্রীতিকে তার পিঠের উপর বসিয়ে সাঁই করে চাঁদের বুড়ির কাছে উড়াল দিল।

অল্প সময়ের মধ্যে প্রীতি চাঁদের দেশে বুড়ির কাছে পৌঁছে গেল। সেখানে গিয়ে দেখল এলাহি আয়োজন। চাঁদের দেশে রঙিন আলোয় ঝলমল করছে, সবকিছুই অনেক সুন্দর করে সাজানো রয়েছে। প্রীতি দূতটির মাধ্যমে জানতে পারে সে আসবে বলে বুড়ি সুন্দর করে প্রতিটি জিনিস সাজিয়েছেন। প্রীতি দূতটিকে প্রশ্ন করে এইসব সাজাতে বুড়িকে কে সাহায্য করেছে? দূত বলল, চাঁদের বুড়ি জাদু দিয়ে এক মুহূর্তে সব করতে পারেন! এরমধ্যে চাঁদের বুড়ি এসে হাজির, একদম ধবধবে সাদা সুন্দর! প্রীতিকে অভ্যর্থনা জানিয়ে অনেক অনেক আদর করল। এইরকম আয়োজন দেখে প্রীতি খুব খুশি হয়ে যায়। প্রীতিকে চাঁদের বুড়ি রাজকীয় চেয়ারের মধ্যে বসিয়ে দিল। প্রীতি তখন চাঁদের বুড়িকে বলল আচ্ছা আমি তোমাকে কি নামে ডাকব? চাঁদের বুড়ি বলল তোমার যা মন চায় তাই ডাকতে পারো, প্রীতি তখন বলল যেহেতু তুমি চাঁদের দেশে থাকো এবং আমার দাদুর বয়সী তাই আমি তোমাকে চাঁদনি দাদু বলে ডাকব। বুড়ি বলল আচ্ছা ঠিক আছে তুমি তাই ডেকো। এরপর প্রীতি বলল দাদু তুমি নাকি অনেক জাদু জানো? তখন দাদু বলল হ্যাঁ! দাদু কথা বলতে বলতেই হাতের মুঠোয় ফু দিতে থাকল, তখন একটা একটা করে খাবার এসে হাজির হয়ে গেল! এটা দেখে প্রীতি রীতিমতো অবাক! পরে দাদু খাবারগুলো প্রীতির হাতে তুলে দেন, খাবারগুলো একদম টাটকা ও সুস্বাদু। সে মজা করে অনেক খাবার খেল।

পেট পুরে খাওয়া দাওয়া সেরে প্রীতি ও দাদু দুইজনে গল্পে গল্পে অনেক কথা বলতে থাকল। তখন প্রীতি দাদুকে আবার যাদু দেখাতে অনুরোধ করে। দাদু আবার হাতের মুঠোয় ফু দিয়ে যাদু দিয়ে নানান ধরনের খেলনা একটা একটা নিয়ে প্রীতির হাতে তুলে দেন। খেলনা পেয়ে প্রীতি অনেক খুশি হয়, এজন্য দাদুকে ধন্যবাদ দিতে ভুল করল না। এরপর প্রীতি দাদুর কাছ থেকে পাওয়া খেলনাগুলো নিয়ে খেলতে থাকল। কিছুক্ষণ পর প্রীতি বলল দাদু আমাকে তো এবারের মতো ফিরতে হবে, আবার সময় করে আরেকদিন তোমার কাছে আসব। দাদু বলল ঠিক আছে, ভালো থেকো নিজের যত্ন নিও। তুমি আবার আসবে কিন্তু! আর আমি দূতটিকে বলে দিচ্ছি তোমাকে যেন সুন্দর মতো পৌঁছে দিয়ে আসে। দূতটি এলে দাদু সমস্ত খেলনা প্রীতিকে দিয়ে এবারের মতো বিদায় দেন। আর এদিকে মা চাচি তাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান। আগের মতো দূতটির পিঠের উপর বসে সাঁই করে মা চাচির কাছে ফিরে আসলো। প্রীতিকে দেখতে পেয়ে মা-চাচিরা জিজ্ঞেস করলে চাঁদের বুড়ির ঘঠনাটি তাদের বলায় তারাও অবাক হয়ে যান! ❑

শিশুসাহিত্যিক

গল্প

ভূতের পিছু পিছু

সালাম হাসেমী

আরিফ কাশদোলা কলেজের কনসার্ট শেষ হলে কলেজের সামনের রাস্তার ওপর এসে দাঁড়ায়। মোবাইলের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে রাত ২ ঘটিকা। রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে ভাবল তার রূপডাঙ্গা গ্রামে যাওয়ার মতো কোনো সাথি পাওয়া যায় কিনা। কনসার্ট শেষে যে যার বাড়িতে চলে যাচ্ছে। আরিফ তাকিয়ে তাকিয়ে লোকগুলোকে দেখছে। কিন্তু তার গ্রামের কোনো লোক পাচ্ছে না দেখে সে খুব চিন্তায় পড়ে গেল। আরিফের বাড়ি রূপডাঙ্গা গ্রামে । এ কাশদোলা কলেজ থেকে পাঁচ গ্রাম পরে।

কাশদোলা কলেজ থানা শহরে। রূপডাঙ্গা গ্রামে যেতে হলে এখান থেকে অটোবাইকে চড়ে যেতে হবে গজার বিলের ঘাট। চৈত্র মাস বলে বিল শুকনা তাই পায়ে হেঁটেই যেতে হবে। আরিফ ঢাকাতে একটি কলেজে লেখাপড়া করে। বাড়িতে আসার জন্য ঢাকা থেকে রওয়ানা দিয়ে তাদের থানা শহরে এসে বাস থেকে নামল। নেমেই মাইকের ঘোষণা থেকে জানতে পারল যে, আজ রাত ৯ ঘটিকার সময় কাশদোলা কলেজে গানের কনসার্ট হবে। সুদূর ঢাকা থেকে নামিদামি শিল্পীরা আসবেন গান পরিবেশনের জন্য। এ ঘোষণা থেকে আরিফ সিদ্ধান্ত নিল যে , আজ সে কনসার্ট দেখে তারপরে বাড়িতে যাবে। কনসার্ট দেখার জন্য কলেজ চত্বরে গিয়ে দাঁড়ালো।

কনসার্ট শেষে বাড়িতে ফেরার জন্য সঙ্গীর অপেক্ষায় আছে। যখন সে দেখল একে একে সবাই কলেজ চত্বর থেকে চলে যাচ্ছে। ফাঁকা মাঠে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কিছু পথ পায়ে হেঁটে অটোবাইকে উঠে চলে গেল গজার বিলের ঘাটে। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে চলল গজার বিলের ভিতর দিয়ে। ঘুটঘুটে অন্ধকার। দুই ফুট দূরের কোনো কিছু দেখা যায় না, অনুমানে পথ চলছে। মোবাইলের লাইট দিয়ে পথ চলবে তারও উপায় নেই। মোবাইলের চার্জ শেষ। এখন মোবাইলে লাইট জ্বলে না। অন্ধকারে পথ চলছে আর অনুমান করার চেষ্টা করছে সামনে কোনো লোকজন আছে কিনা। হঠাৎ আরিফের মনে হলো তার সামনে ২০/২৫ হাত দূরে কে যেন হেঁটে যাচ্ছে। সামনে কে যাচ্ছো ভাই আগে আগে ? একটু দাঁড়াও ভাই একসাথে যাই। গল্প করতে করতে যাই। সামনের লোকটি হাঁটছে আর বলছে, 'আসো তাড়াতাড়ি আসো।'

বিলম্ব করা যাবে না। রাত অনেক হয়েছে। সামনের লোকটির কথা মতো আরিফ আরো জোরে হেঁটে তাকে ধরতে পারে না। দুজনের দূরত্ব আগের মতো রয়েছে। আরিফ যতই তাড়াতাড়ি হাঁটে সামনের লোকটির কাছাকাছি হতে পারে না। পিছন থেকে ডাক দিলে নাকিসুরে কথার উত্তর দেয়। আরিফ এখন সামনের লোকটির কাছাকাছি হওয়ার জন্য কিছুটা লাফিয়ে লাফিয়ে দৌড়ের মতো করে হাঁটছে। তার কাছে মনে হচ্ছে যে সামনের লোকটি হাঁটছে না যেন শূন্য দিয়ে উড়ছে।

আরিফ হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে পারছে না বলে দীর্ঘ শ্বাস নিতে নিতে সামনের লোকটিকে জিজ্ঞেস করল, তোমার নাম কী ভাই? কোন বাড়ির ছেলে তুমি? সামনের লোকটি নাকিসুরে জবাব দিল, আমি রায় বাড়ির ছেলে যতীন। 'কেন তুমি আমাকে চিনো না'। আমরা একসাথে রূপডাঙ্গা পাইমারি স্কুলে পড়েছি।' ও যতিন একটু দাঁড়া। দুজনে একসাথে যাই। দাঁড়ানোর সময় নাই, তুমি আমার পিছু তাড়াতাড়ি হেঁটে আসো। রাত গভীর হয়ে যাচ্ছে। রূপডাঙ্গা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যেতে সমস্যা হবে। তাড়াতাড়ি এসো। নাকিসুরে বলল। আরিফ বলল, দোস্ত যতীন শোনো, মনে যখন ভয় ভয় লাগে তখন চড়া সুরে গান গাইলে মনের মধ্যে ভয় থাকতে পারে না। আমরা দুজনে গান গাই। যতীন নাকিসুরে বলল, 'দোস্ত এখন আমার গান গাওয়ার অবস্থা নেই।

আমি এখন আর সেই যতীন নেই। তুমি গান ধরো।' দুজনে কথাবার্তা বলতে বলতে রূপডাঙ্গা জঙ্গলের

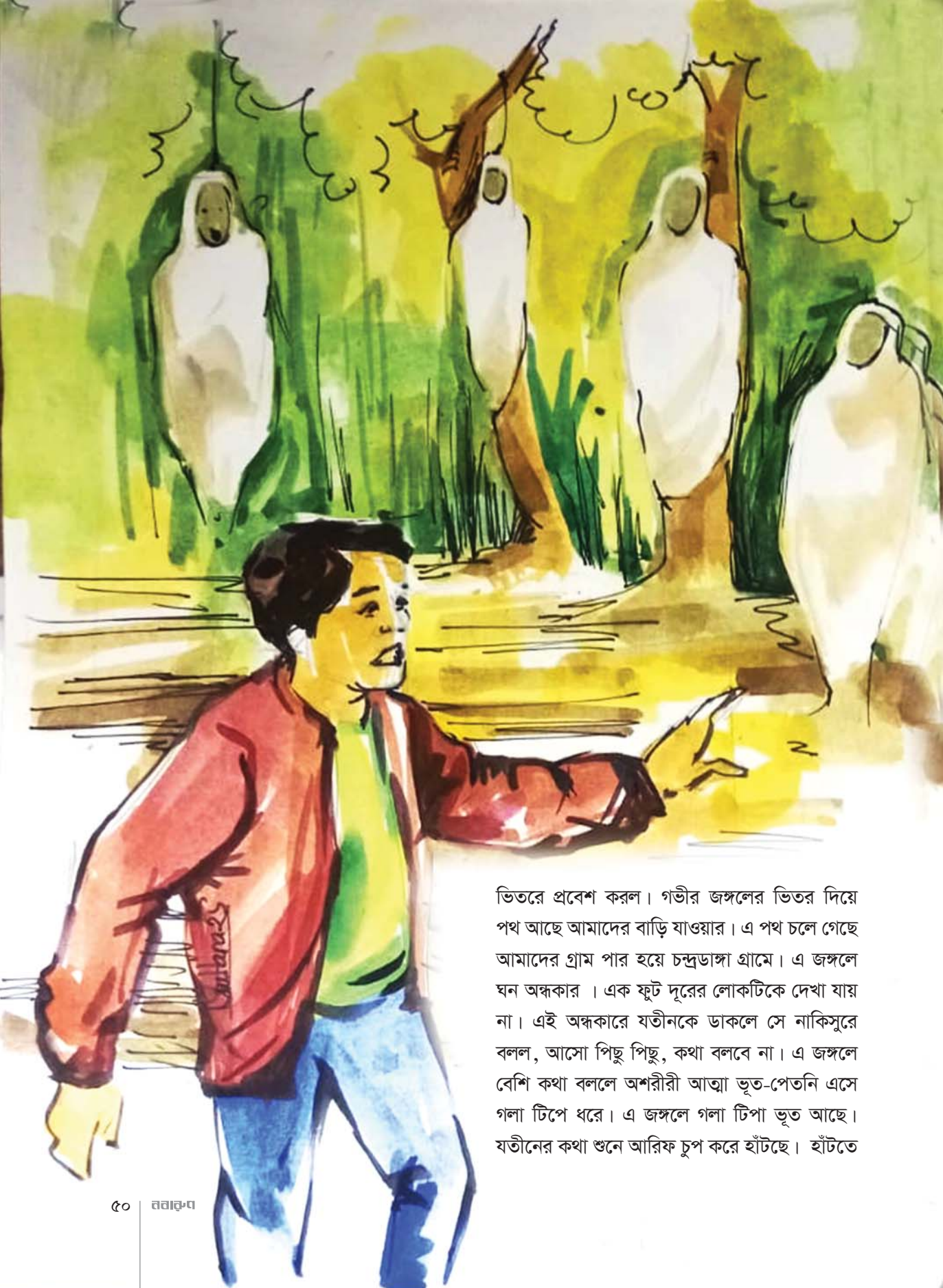

ভিতরে প্রবেশ করল। গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পথ আছে আমাদের বাড়ি যাওয়ার। এ পথ চলে গেছে আমাদের গ্রাম পার হয়ে চন্দ্রডাঙ্গা গ্রামে। এ জঙ্গলে ঘন অন্ধকার । এক ফুট দূরের লোকটিকে দেখা যায় না। এই অন্ধকারে যতীনকে ডাকলে সে নাকিসুরে বলল, আসো পিছু পিছু, কথা বলবে না। এ জঙ্গলে বেশি কথা বললে অশরীরী আত্মা ভূত-পেতনি এসে গলা টিপে ধরে। এ জঙ্গলে গলা টিপা ভূত আছে। যতীনের কথা শুনে আরিফ চুপ করে হাঁটছে। হাঁটতে

হাঁটতে ঘন গাছপালা এলাকা পেরিয়ে হালকা গাছের এলাকায় এলে শেষ রাতের চাঁদের আলোতে সামনে কিছুটা দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ আরিফের মাথার ওপর কার যেন পায়ের ঠান্ডা শীতল ছোঁয়া লাগল।

তৎক্ষণাৎ সে ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখল, ভূত লম্বা হাত তার দিকে বাড়িয়ে দিলে সে ভয়ে পিছিয়ে গেল। ঝুলন্ত ভূতটির হাত দুটি আরো লম্বা হয়ে আরিফকে ধরতে চাইলে সে আরো পিছিয়ে গেল। এ দৃশ্য আরিফ এক নজর দেখার সাথে সাথে ভীষণ ভয়ে তার শরীরের শিরদাঁড়া দিয়ে একটি ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল। গায়ের সমস্ত লোম দাঁড়িয়ে গেল। ভয়ে তার শরীরের রক্ত চলাচল বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলো। সে যেদিকে তাকায় সেদিকেই গাছের ডালে ইয়া বড়ো বড়ো চোখে তাকিয়ে থাকা ভূতটিকে ঝুলতে দেখতে পায়।

এ দৃশ্য দেখে চিৎকার করে উঠে বলে, 'যতীন তুমি কোথায়, আমাকে বাঁচাও। আমাকে ভূতে ধরেছে।' এ কথা শেষে অচেতন হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। আরিফ ওভাবেই পড়ে থাকে। তার চেতনা ফিরে পেলে চারদিকে তাকিয়ে দেখে এখন সকাল। সূর্যোদয় হয়েছে। তার শরীর দুর্বল। হাঁটতে কষ্ট হয়।

তবু ধীরে ধীরে বাড়িতে যায়। বাড়ি ফিরে গত রাতের সমস্ত ঘটনা বাড়ির ও আশপাশের লোকের কাছে বললে সবাই বলল যে, রায় বাড়ির ছেলে যতীন এক সপ্তাহ পূর্বে রূপডাঙ্গা জঙ্গলে গভীর রাতে মারা যায়। আর সেই যতীনই তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেছে। এ কথা শুনে আবারো তার শরীর ভয়ে কাঁপুনি দিয়ে উঠল। ভয়ে সে তার মাকে জড়িয়ে ধরল। তাই রাত বিরাতে বাড়ির লোক ছাড়া একা কোথাও যেতে নেই। ❑

শিশুসাহিত্যিক

আবিদা সুলতানা, দশম শ্রেণি, বাংলাবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

সবচেয়ে বড়ো ১০ পাখি

রায়হান সাইফুর চৌধুরী

পৃথিবীতে প্রায় ১০ হাজার প্রজাতির পাখি আছে। এর মধ্যে সবচেয়ে ছোটো পাখি যেমন আছে, তেমনি আছে সবচেয়ে বড়ো পাখিও। কোনো কোনো পাখি এতই বড়ো যে এগুলোর উচ্চতা যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল বাস্কেটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এনবিএ) যে-কোনো খেলোয়াড়ের চেয়ে বেশি। আবার কোনো কোনো পাখির ডানা এত বড়ো যে এগুলো কিং সাইজ খাটের সমান জায়গাজুড়ে ছড়ানো থাকে।

বিশ্বে সবচেয়ে বড়ো বলে বিবেচিত এমন কিছু প্রজাতির পাখি নিয়ে এই প্রতিবেদনটি নবারুণ পাঠকদের জন্য তুলে ধরা হলো:

উটপাখি

বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো প্রজাতির পাখি হলো উটপাখি। আকার ও ওজনের দিক থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো হলেও উটপাখি উড়তে পারে না। স্যান ডিয়েগো জুওয়াইল্ডলাইফ অ্যালায়েন্সের তথ্য অনুসারে, এ

পাখির উচ্চতা ৯ ফুট পর্যন্ত হয় এবং ওজন হতে পারে ২৮৭ পাউন্ড বা ১৩০ কেজি পর্যন্ত। তবে ৭ ফুট পর্যন্ত চওড়া ডানা থাকার পরও এ পাখি উড়তে পারে না। নৌকা যেভাবে পাল ব্যবহার করে চলে, একইভাবে উটপাখিও এর ডানা ব্যবহার করে থাকে। উটপাখি ঘণ্টায় ৪৩ মাইল পর্যন্ত দৌড়াতে পারে।

হারপি ঈগল

হারপি ঈগল বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো পাখিগুলোর একটি। গাঢ় ধূসর রঙের পাখিগুলো ওজনের দিক থেকে বড়ো ঈগল প্রজাতির। স্যান ডিয়েগো

চিড়িয়াখানার হিসাব অনুসারে, একটি পরিণত স্ত্রী হারপি ঈগলের ওজন ২০ পাউন্ড বা ৯ কেজি পর্যন্ত। আর পুরুষ হারপির ওজন ১২ পাউন্ড বা ৫ দশমিক ৪ কেজি পর্যন্ত হয়। দক্ষিণ আমেরিকায় এ ধরনের পাখির দেখা মেলে। শিকারের প্রয়োজন হলে এরা এদের সাড়ে ৬ ফুট চওড়া ডানা মেলে শিকারের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। সজারু, হরিণের মতো বড়ো বড়ো প্রাণী শিকার করে খায় হারপি ঈগল। শিকারের দেখা পেলে ঘণ্টায় ৫০ মাইল গতিতে নিচের দিকে নেমে এসে ছোঁ মেরে ধরে ফেলে।

ইমু পাখি

উচ্চতার দিক থেকে উটপাখির পর ইমু বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উঁচু প্রজাতির পাখি। এর উচ্চতা ৬ দশমিক ২ ফুট পর্যন্ত হয়। এটি অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে বড়ো পাখি হলেও এই পাখি উড়তে পারে না, তবে দৌড়াতে পারে। শুধু দৌড়াতে পারে না এরা ঘণ্টায় ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত দৌড়াতে পারে। স্মিথসোনিয়ান'স ন্যাশনাল জু অ্যান্ড কনজারভেশন বায়োলজি ইনস্টিটিউটের তথ্য অনুসারে, ইমু পাখির পা অনেক শক্তিশালী । যথেষ্ট খাবার ও পানি পেলে এগুলো দীর্ঘপথ ভ্রমণ করতে পারে।

মারাবু স্টর্ক

আফ্রিকার সাহারা অঞ্চলের পাখি মারাবু স্টর্ক। এটি হলো বিশ্বে স্টর্ক প্রজাতির মধ্যে সবচেয়ে বড়ো পাখি। এর উচ্চতা প্রায় পাঁচ ফুট। ডানা সাড়ে আট ফুট পর্যন্ত ছড়ানো থাকে। মারাবু পাখির ওজন ২০ পাউন্ড বা ৯ কেজি পর্যন্ত হতে পারে।

মারাবু স্টর্ক মূলত মৃত প্রাণীর খাবার খেয়ে থাকে। এগুলোর মাথায় লোম নেই। এক তথ্য অনুসারে, টাক মাথা হওয়ার কারণে এ ধরনের পাখি অভিযোজনের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা পেয়ে থাকে। কারণ, এ পাখি যখন মৃত প্রাণীর শরীরের ভেতর মাথা ঢুকিয়ে দেয়, তখন টাক মাথা হওয়ার কারণে এদের মাথায় রক্ত লেগে থাকে না। এদের মাথায় যদি রক্ত লেগে থ াকত, তবে তা এ পাখির স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলত।

ওয়ান্ডারিং অ্যালবাট্রস

ওয়ান্ডারিং অ্যালবাট্রস বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো ডানাবিশিষ্ট পাখি। ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর দ্য

কনজারভেটিভ অব নেচারের (আইইউসিএন) তথ্য অনুযায়ী, এই পাখিরা সমুদ্রের ওপর দিয়ে প্রায় ১১ ফুট চওড়া ডানা মেলে উড়ে বেড়ায়।

ওয়ান্ডারিং অ্যালবাট্রস বড়ো ডানা মেলে বেশিরভাগ সময় আকাশে উড়তে পছন্দ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ওয়ান্ডারিং অ্যালবাট্রস প্রজাতির একটি পাখিকে মাত্র ১২ দিনে প্রায় ৩ হাজার ৭০০ মাইল পথ পাড়ি দিতে দেখা গেছে।

ডালমেশিয়ান পেলিকান

ডালমেশিয়ান পেলিকান বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো উড়ন্ত পাখিগুলোর একটি। এর ডানা প্রায় ১১ ফুট চওড়া হয়। এসব পাখি অনেক উঁচুতে উড়তে পারে। এসব পাখির ওড়াওড়ি পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, এগুলো ১০ হাজার ফুটের বেশি উঁচুতেও উড়তে সক্ষম- অ্যারিজোনা নেচার কনজারভেশন এমন তথ্য

জানিয়েছে। ডালমেশিয়ান পেলিকানদের ক্ষুধাও অনেক বেশি। এক অ্যালায়েন্সের তথ্য অনুসারে একটি পরিণত পেলিকান দিনে প্রায় ৪ পাউন্ড বা ১ দশমিক ৮ কেজি মাছ খেতে পারে।

গ্রেটার রিয়া

এই পাখি দেখতে কম বয়সি উটপাখির মতো। দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলে বিচরণকারী এ পাখির আকার একটি পরিণত উটপাখির এক-পঞ্চমাংশের মতো। তবে গ্রেটার রিয়া পাখির ওজন ৬৬ পাউন্ড বা ৩০ কেজি পর্যন্ত হতে পারে। স্মিথসোনিয়ান'স ন্যাশনাল এক ইনস্টিটিউটের তথ্য অনুসারে, এগুলো পাঁচ

ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। এ পাখিও উড়তে পারে না। উটপাখির মতো করে এটিও দৌড়ানোর সময় ভারসাম্য ধরে রাখতে ডানাগুলো ব্যবহার করে। এসব পাখি ঘণ্টায় ৪০ মাইল পর্যন্ত গতিতে দৌড়াতে পারে।

ক্যাসোওয়ারি

নিউগিনি ও অস্ট্রেলিয়ার মূল ভূখণ্ডে ক্যাসোওয়ারি পাখির বিচরণ দেখা যায়। অস্ট্রেলিয়ান মিউজিয়ামের তথ্য অনুসারে, ক্যাসোওয়ারি বিশ্বের সবচেয়ে লম্বা পাখিগুলোর একটি। ছয় ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট ক্যাসোওয়ারির মাথার ওপর হেলমেটের মতো একটি

অংশ থাকে। এটি ঘন কেরাটিনের তৈরি। এডিনবরা চিড়িয়াখানার তথ্য অনুসারে, পাখিটি জঙ্গলের মধ্যে ছুটে চলার সময় লতাপাতা সরাতে এ হেলমেট ব্যবহার করে। এটি যেমন একটি বড়ো প্রজাতির পাখি, তেমনি বিপজ্জনকও বটে। হাতে গোনা যে কয়েকটি পাখির আক্রমণে মানুষের মৃত্যু হয়, তেমনই একটি পাখি এটি।

গ্রেট বাস্টার্ড

মধ্য এশিয়া অঞ্চল, রাশিয়া ও মরক্কোতে এ পাখি দেখা যায়। গ্রেট কাস্টার্ড ইউরোপের স্থলভাগে চলাচলকারী সবচেয়ে বড়ো পাখি।

পুরুষ গ্রেট বাস্টার্ড পাখির ওজন ৩১ পাউন্ড বা ১৪ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। এগুলো প্রায় ৪ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়। দিন দিন এ পাখির সংখ্যা কমছে। বার্ডলাইফ ইন্টারন্যাশনালের তথ্য অনুসারে, ১৯৬০-এর দশক থেকে বিশ্বজুড়ে এ পাখির সংখ্যা ৩০ শতাংশের বেশি কমেছে।

শুবিল

আফ্রিকা অঞ্চলের সবচেয়ে লম্বা পাখিগুলোর একটি হচ্ছে শুবিল পাখি। এগুলোর উচ্চতা পাঁচ ফুট পর্যন্ত হতে পারে। অ্যানিমেল ডায়ভার্সিটি ওয়েবের তথ্য অনুসারে, এসব পাখি সাধারণত মিঠাপানির জলাভূমির মধ্যে থাকা মাছ ও অন্যান্য ছোটো জলজ প্রাণী শিকার করে এদের সময় কাটে। বেশিরভাগ সময় এরা শিকার খোঁজার জন্য পানিতে ঝাঁপাঝাঁপি করে থাকে।

তথ্যসূত্র : ইন্টারনেট

মৃত সাগর কেন মৃত

পূর্বে জর্ডান, পশ্চিমে ইসরাইল এবং ইসরাইল অধিকৃত পশ্চিম তীর। মাঝখানে মৃত সাগর। ইংরেজি নাম, ডেড সি। নাম শুনে যা বোঝা যায়, বাস্তবতাও তাই। জলাশয় যেখানে সাধারণত ব্যাপক প্রাণের আধার হয়, সেখানে এই গোটা জলাশয় একদম মৃত। তবে জলাশয়টির নামের ভেতরে একটা সমস্যা আছে। মৃত 'সাগর' আসলে সাগর নয়, লেক- বাংলায় যাকে বলে হ্রদ।

বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল নিয়ে যেমন মানুষের মনে অনেক কৌতূহল রয়েছে, তেমনি অনেকেই আবার এই মৃত সাগর নিয়ে চিন্তিত। তাদের মনে প্রশ্ন জাগে, এই হ্রদ কি সত্যিই মৃত? আর মৃত হলে, কেনইবা মৃত?

প্রশ্নটা অনেক জটিল মনে হলেও উত্তরটা কিন্তু খুব সরল। এ সাগরের পানিতে লবণের ঘনত্ব অনেক বেশি। সেজন্যই দৃশ্যমান কোনো প্রাণ এখানে দেখা যায় না। আসলে, সাধারণ জলজ প্রাণ- যেমন মাছ ও জলজ উদ্ভিদ- এখানে বাঁচতেই পারে না প্রচণ্ড ঘন লবণের জন্য। প্রশ্ন আসে, এখানে লবণের ঘনত্ব অন্যান্য সমুদ্র বা লবণাক্ত জলাধারের তুলনায় কত বেশি? গড়ে সমুদ্রের পানিতে প্রায় সাড়ে ৩ শতাংশ লবণ থাকে। সহজ করে বললে, ১ লিটার সমুদ্রের পানিতে দ্রবীভূত লবণ থাকে মাত্র ৩৫ গ্রাম। আরও ভেঙে বললে, ১ লিটারকে বলতে পারেন ১ হাজার গ্রাম (সমতুল্য)। তারমানে ১ হাজার গ্রামে মাত্র ৩৫ গ্রাম লবণ থাকে। আর মৃত সাগরে এ লবণের পরিমাণ ৩৪.২ শতাংশ! মানে ১ হাজার গ্রামে প্রায় ৩৪২ গ্রাম! আর সাধারণ সমুদ্রের তুলনায় এখানে পানির উচ্চতাও অনেক কম। সমুদ্রপৃষ্ঠের প্রায় ৪০০ মিটার নিচে।

কেমন করে এমন হলো? ভূতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ থেকে বিজ্ঞানীরা বলছেন, প্রায় ৩ মিলিয়ন বা ৩০ লাখ বছর আগে এ অঞ্চলের টেকটোনিক প্লেট বা মহাদেশীয় পাতগুলো যখন পরস্পর থেকে সরে যেতে শুরু করে, তখন এখানে তৈরি হয় বিশাল খাদ। এই খাদ মেডিটেরেনিয়ান সি বা ভূমধ্যসাগরের সঙ্গে যুক্ত ছিল। সেখান থেকে লবণাক্ত পানি এসে পড়ে খাদে গড়ে ওঠে মৃত সাগর। তখনো কিন্তু এটি মৃত নয়, সেটা ঘটেছে পরের কয়েক মিলিয়ন বছরে।

টেকটোনিক প্লেট বা মহাদেশীয় পাতের কয়েক মিলিয়ন বছরের নড়াচড়ায় ধীরে ধীরে ওপরে উঠে যায় এ অঞ্চলের ভূমি। ফলে ভূমধ্যসাগর ও অন্যান্য জলাশয় থেকে এটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, পরিণত হয় হ্রদে। এখন এর লবণাক্ত পানি এক জায়গায় আবদ্ধ। কিন্তু এ অঞ্চলে পানি বাষ্পীভূত হওয়ার হার বেশি, বৃষ্টিপাতের হার কম। অর্থাৎ পানি বাষ্পীভূত হয়ে কমে যাচ্ছে দিন দিন, কিন্তু লবণ রয়ে যাচ্ছে নিচে। নতুন পানি আসার পথও নেই। ফলে বাড়তে থাকে লবণের ঘনত্ব। ধীরে ধীরে লবণের ঘনত্ব বেড়ে গিয়ে স্বল্প পানি পরিণত হয় হাইপারস্যালাইনে, যা মেরে ফেলে এখানকার মাছ, জলজ উদ্ভিদ ও অন্যান্য জীবদের। এভাবে কালের আবর্তে হ্রদটি পরিণত হয় মৃত সাগরে।

প্রতিবেদন : রেহানা বেগম

শীতে শিশুর রোগব্যাধি

শীতের সময় কিছু রোগব্যাধির প্রকোপ বাড়ে। বিশেষ করে শিশু ও বয়স্কদের জন্য সময়টা ঝুঁকিপূর্ণ। এই সময় ঠান্ডাজনিত সমস্যাগুলোই বেশি দেখা যায়। যেমন- কাশি ও অ্যাজমার প্রকোপ বেড়ে যাওয়া, সাময়িক জ্বর ও কোল্ড অ্যালার্জি।

বাতাসে ধুলাবালি বেশি থাকায় অনেকের অ্যালার্জি বা শ্বাসকষ্টের মতো সমস্যা দেখা দেয়। সঠিক সময়ে শনাক্ত না হলে অনেক সময় নিউমোনিয়াতেও তা রূপ নিতে পারে। অনেকের টনসিল বেড়ে গিয়ে ব্যথারও সৃষ্টি হতে পারে।

এছাড়া ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া ইত্যাদি মশাবাহিত রোগের প্রকোপ দেখা গেছে এ বছর। ডেঙ্গু বর্ষাকালীন রোগ হলেও এবার শীতকালে এর বিস্তার দেখা যাচ্ছে। তাই মশার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। কাঁপুনি দিয়ে উচ্চমাত্রার জ্বর, বারবার জ্বর, গিঁটে ব্যথা ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দিলেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। অনেক সময় ঠান্ডার কারণে হঠাৎ শিশুদের ডায়রিয়া হতেও দেখা যায়।

যা করতে হবে

শীত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কুসুম গরম পানিতে গোসল বা হাত-মুখ ধোয়ার অভ্যাস করতে হবে। শিশুদের গরম কাপড়ের পাশাপাশি সব সময় হাত ও পায়ে মোজা পরানো জরুরি। এ সময় ত্বকও শুষ্ক হয়ে ওঠে। ফলে চুলকানি বা ব্যথা অনুভূত হতে পারে। অ্যালার্জির কারণেও এমনটা হয়। তাই নিয়মিত লোশন বা অলিভ অয়েল, নারিকেল তেল বা গ্লিসারিন ব্যবহার করা যেতে পারে। তাহলে ত্বক স্বাভাবিক ও আর্দ্র থাকবে।

যাদের ধুলোবালুতে অ্যালার্জির সমস্যা আছে, তাঁদের এ রকম চুলকানি দেখা দিলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। ঠান্ডা একেবারে এড়িয়ে চলতে হবে। এ সময় ঠান্ডা খাবার, যেমন আইসক্রিম, কোক এগুলো এড়িয়ে চলা উচিত।

শীতের সময়ে প্রচুর পানি খাওয়া উচিত। এছাড়া ভিটামিন সি যুক্ত খাবার যেমন জলপাই, পেয়ারা কমলা, লেবু, আমলকি ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে খেতে হবে। এগুলো এক প্রকার প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করে। শিশুরা অনেক সময় শরীরে গরম কাপড় রাখে না বা খুলে ফেলে। তাই তাদের দিকে সতর্ক নজর রাখা উচিত। বাইরের দূষিত খাবারের ক্ষেত্রেও সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

ট্রি অফ লাইফ

একটি গাছের কাণ্ডে জমে থাকা পানির উপর ভরসা করে চলে কিছু মানুষের জীবন। শুধু তাই নয়, বিশাল আকৃতির হওয়ায় এই গাছের ভেতর মানুষ ঘর বানিয়েও বসবাস করে। বিস্ময়কর এমনই এক গাছের কথা বলব তোমাদের।এই গাছটিকে বলা হয়, ট্রি অফ লাইফ। আসল নাম অ্যাডানসোনিয়া ডিজিটাটা, যাকে সাধারণত আফ্রিকান বাবোবাব গাছ বলা হয়। এটি একটি বিখ্যাত গাছ যা আফ্রিকার উপ-সাহারান অঞ্চলে পাওয়া যায়। এটি তার অস্বাভাবিক আকার, দীর্ঘায়ু এবং পরিবেশগত অভিযোজনের জন্য পরিচিত। নিজের কাণ্ডে অনায়াসে লক্ষাধিক লিটার পানি ধরে রাখতে পারে। শুনতে অবাক লাগছে তাই না? কিন্তু এটাই সত্যি।

গাছটি ৩-৪ হাজার বছর পর্যন্ত শুষ্ক আবহাওয়ায়ও বেঁচে থাকতে পারে। যা স্থানীয় সম্প্রদায়ের কাছে খাদ্য, পানি, ওষুধ এবং আশ্রয়ের উৎস হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। অ্যাডানসোনিয়া ডিজিটাটার কাণ্ড সাধারণত মোটা এবং বোতলের মতো আকার ধারণ করে। গাছটি তার কাণ্ডে প্রচুর পানি জমা রাখতে পারে, যা শুষ্ক মৌসুমে ব্যবহৃত হয়। একটি পূর্ণবয়স্ক বাবোবাব গাছের কাণ্ডে ১ হাজার থেকে ১ লাখ ২০ হাজার লিটার পর্যন্ত পানি জমা থাকতে পারে। গাছটি এ ধরনের অভিযোজনের মাধ্যমে শুষ্ক পরিবেশে টিকে থাকতে সক্ষম।

প্রচণ্ড খড়ায় যখন চারদিকে পানি মেলে না তখন এ গাছই মানুষের পানির একমাত্র ভরসা। অ্যাডানসোনিয়া ডিজিটাটার ফল লম্বা ডিম্বাকৃতির এবং শক্ত খোসাযুক্ত। ফলের ভেতরে থাকা পাল্প পুষ্টিতে ভরপুর এবং এটি বানান ফল নামে পরিচিত। এতে প্রচুর ভিটামিন সি, ক্যালসিয়াম এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে, যা স্থানীয় খাদ্য ও ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অ্যাডানসোনিয়া ডিজিটাটা গাছটি মাটির গভীর স্তর থেকে পানি শোষণ করতে পারে। এছাড়াও কাণ্ডে জমে থাকা পানি স্থানীয়রা কেটে বের করে পান করতে পারে। এই গাছের কাঠ তুলনামূলকভাবে নরম এবং স্পঞ্জের মতো, যা পানিকে সংরক্ষণ করতে সাহায্য করে। এটি শুষ্ক মরুভূমি অঞ্চলে টিকে থাকার জন্য একটি অপরিহার্য ব্যবস্থা।

বাবোবাব গাছটি অনেক প্রাণীর জন্য আশ্রয়স্থল। পাখি, বাদুড় এবং কীটপতঙ্গ এই গাছের উপর নির্ভরশীল। গাছটি মাটির উর্বরতা বজায় রাখে এবং ক্ষয় রোধে সাহায্য করে। গাছের বিভিন্ন অংশ খাদ্য, ওষুধ, কাপড় এবং পানীয় তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এটি স্থানীয় অর্থনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অ্যাডানসোনিয়া ডিজিটাটা গাছের কাণ্ডে জমে থাকা পানি সাধারণত আফ্রিকার শুষ্ক ও আধা-মরু অঞ্চলের মানুষেরা পান করে। এই গাছটি মূলত আফ্রিকার সাহেল অঞ্চল, যা সাহারা মরুভূমির দক্ষিণে বিস্তৃত এবং এর আশপাশের দেশগুলোতে বেশি পাওয়া যায়।

নাইজারের মরু অঞ্চলে বাবোবাব গাছ থেকে পানি সংগ্রহ করা একটি প্রচলিত প্রথা। সুদানে খরার সময় স্থানীয় জনগণ বাবোবাব গাছ কেটে তার ভেতরের পানি ব্যবহার করে। আবার সেনেগালে গ্রামীণ মানুষ এই গাছকে জীবনদাতা হিসেবে বিবেচনা করে এর পানি ব্যবহার করে। শুধু মানুষ নয় অনেক পশুপাখিরও পানির উৎস এই গাছ। সর্বোপরি বলতে গেলে এ যেন এক বিস্ময়কর গাছ।

প্রতিবেদন: জিসান আহমেদ

পদক জয়ী নাইমা

অনেক কষ্ট পেরিয়ে আলোর মশাল হয়ে জ্বলে উঠেছেন এক নারী । সাফ গেমস ও সাউথ এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে সিলভার পদক জয় করেন তিনি এবং বাংলাদেশের মেয়েদের মধ্যে কারাতে দ্বিতীয় ড্যান অর্জনের বিরল কৃতিত্বের অধিকারীও তিনি। তিনি আর কেউ নন, নাইমা খাতুন। কারাতে খেলোয়াড় ও প্রশিক্ষক নাইমা খাতুন। তিনি রাজশাহীর মেয়ে।

স্কুলে যাওয়ার বয়স থেকেই নাইমা খাতুনকে লড়াই করতে হয়েছে জীবনের কঠিন বাস্তবতার সঙ্গে। চরম দারিদ্র্যের মধ্যে কেটেছে তার ছেলেবেলা। মায়ের কাছেই বড়ো হয়েছেন তিনি। জুটমিলে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন তার মা মুনজুয়ারা। তিন বোনকে নিয়ে মায়ের সংসার। মায়ের কষ্ট কিছুটা কমানোর জন্য নাইমা নিজেও টুকটাক কাজ করে সংসার চালাতে মাকে সাহায্য করতেন। ১২ বছর বয়সেই বাবা তাদের ছেড়ে চলে যায়।

তার মায়ের ইচ্ছে ছিল মেয়েদের পড়াশোনা করিয়ে নিজের পায়ে দাঁড় করানোর। তাই কষ্ট করে হলেও মেয়েদের পড়াতেন। নাইমা হেঁটে স্কুলে যাওয়ার পথে রাস্তার পাশে মার্শাল আর্ট শেখাতে দেখতেন। দেখতে দেখতে মার্শাল আর্টের প্রতি তার আগ্রহ তৈরি হয়। সেখানে খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন এটি অনেক খরচের ব্যাপার। খরচের কথা ভেবে ঘাবড়ে যান। ঠিক তখনই তার এক বন্ধু তাকে 'বাংলাদেশ ইয়াং কিং কারাতে সেন্টার'-এর খোঁজ দেন, যেখানে নিম্ন আয়ের মানুষদের এবং নৃগোষ্ঠীর ছেলে-মেয়েদের কারাতে শিখতে কোনো টাকাপয়সা খরচ হয় না। নাইমা লেগে পড়লেন কারাতে শিখতে আর নিজের স্বপ্ন পূরণ করতে।

এসএসসি পাশ করে পলিটেকনিক্যালে ভর্তি হন নাইমা। ততদিনে সেলাইয়ের কাজ তার আয়ত্তে, পাশাপাশি পার্লারের কাজ শিখে পার্টটাইম কাজ করতে শুরু করেন পার্লারে। এছাড়াও ইউটিউব দেখে হ্যান্ড পেইন্টিং শিখতে শুরু করেন।

এত কিছুর পরও নাইমা মনোবল হারাননি। মায়ের কাছ থেকেই তিনি শিখেছেন কীভাবে লড়তে হয়, আত্মসম্মান নিয়ে বাঁচতে হয়। জেলা পর্যায়ে ভালো ফলাফল করে ন্যাশনালে চান্স পান। পরেরবার ২০১৮ সালে ন্যাশনালে খেলে সিলভার পদক অর্জন করেন। ২০১৯-এ সাফ গেমস খেলার সুযোগ পেয়ে সেখানেও সিলভার পদক পান। একই বছর সাউথ এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ পদক পান। এরপর তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে যায়। খেলার মাধ্যমে তার বাংলাদেশ আনসারে চাকরির সুযোগ আসে।

২০২২ সালে সাউথ এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে দুটো সিলভার পদক পান এই অদম্য নারী এবং ২০২৩ সালে অর্জন করেন কারাতের দ্বিতীয় ড্যান।

তিনি এখন যে ক্লাবে কারাতে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন, বর্তমানে সেই ক্লাবের মহিলা প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। সম্প্রতি রাঁধুনি কীর্তিমতী সম্মাননা অ্যাওয়ার্ড ২০২৪-পেয়েছেন এই হার না মানা নারী।

দৃঢ়চেতা এই সাহসী নারী দেশের পতাকা বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে চান আরো অনেকবার। দেশের জন্য খেলে ভবিষ্যতে আরো পদক নিয়ে এসে প্রিয় স্বদেশকে উপহার দিতে চান এই মার্শাল আর্টিস্ট।

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

কায়নাত মারিয়া, চতুর্থ শ্রেণি, মান্ডা হাই স্কুল, ঢাকা

বিড়ালের শহর ইস্তাম্বুল

বিড়ালেরও রয়েছে শহর! একটা গোটা শহরের চারদিকে শুধু বিড়াল আর বিড়াল। তুরস্কের ইস্তাম্বুল শহরকে বলা হয় বিড়ালের শহর। এই শহরটি বিড়ালের শহর হিসেবে পরিচিত হওয়ার কারণ হলো পুরো শহরজুড়েই বিড়ালে পরিপূর্ণ। এ শহরে প্রায় ২ লক্ষেরও বেশি বিড়াল রয়েছে বলে ধারণা করা হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা এদের দেখাশোনা ও খাবারদাবারের দায়িত্ব পালন করে। বিড়ালগুলো যেন ক্ষুধার্ত না থাকে তাই দোকানদাররাও দোকানের বাইরে পানির বাটি এবং খাবারের টুকরো রেখে দেন। ইস্তাম্বুলের মেট্রোপলিটন পুলিশ রাস্তার বিড়ালদের টিকা দেওয়ার দায়িত্ব পালন করে। কিন্তু কীভাবে এত বিড়াল এল ইস্তাম্বুলের রাস্তায়? ধারণা করা হয়, প্রাচীনকাল থেকেই ইস্তাম্বুলে বিড়ালের উপস্থিতি বিদ্যমান ছিল। ওই সময় বিড়ালের প্রধান কাজ ছিল বন্দর এলাকা ও দোকানপাটের ইঁদুর সামাল দাওয়া। ধীরে ধীরে মানুষের সঙ্গে বিড়ালের সম্পর্ক গড়ে উঠতে থাকে। আর বাড়তে থাকে তাদের সংখ্যাও। তাই শহরের বাসিন্দারাও বিড়ালদের নিজেদের পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে মনে করে। শহরের বিভিন্ন জায়গায় বিড়ালদের থাকার জন্য রয়েছে ছোটো ছোটো ঘর, এছাড়া আছে বিশেষ বিড়াল পার্ক। ইস্তাম্বুলের বিড়ালদের জনপ্রিয়তা এখন বিশ্বব্যাপী। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে এখানকার বিড়ালদের অসংখ্য ছবি ও ভিডিও। বিখ্যাত হয়েছে কিছু বিড়ালও। পর্যটকরা বিড়ালদের দেখার জন্য অতিথি হয়ে আসেন ইস্তাম্বুলে। বিড়ালদের এই জনপ্রিয়তা কেবল পর্যটকদের আকর্ষণই করে না, এটি স্থানীয় অর্থনীতিতেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। ইস্তাম্বুলের রাস্তায় এত বিড়াল থাকলেও পরিচ্ছন্নতা নিয়ে নেই কোনো সমস্যা। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নিয়মিতভাবে রাস্তাঘাট পরিষ্কার করান। ইস্তাম্বুল শুধু ঐতিহাসিক স্থাপত্য ও মনোমুগ্ধকর দৃশ্যের জন্য বিখ্যাত নয়। এটি বিড়ালপ্রেমীদের জন্য যেন এক স্বর্গ।

ভাড়া নেওয়া যেত যে দেশ

আস্ত একটা দেশ ভাড়ায় পাওয়া যেত! তা জানতে কি বন্ধুরা? অদ্ভুত মনে হলেও এক সময় সত্যিই ছিল এমনটা। আজ এমন একটি দেশের কথাই জানাবো তোমাদের। সুইজারল্যান্ড এবং অস্ট্রিয়ার মাঝখানে অবস্থিত ইউরোপের ছোট্ট দেশ লিচেনস্টাইন। ইউরোপের চতুর্থ ক্ষুদ্রতম দেশ এটি। লিচেনস্টাইন একটি আধা-সাংবিধানিক রাজতন্ত্র, যার নেতৃত্বে বর্তমানে রয়েছেন যুবরাজ দ্বিতীয় হান্স-অ্যাডাম। এই অকল্পনীয় অভিজ্ঞতাকে সম্ভব করার জন্য লিচেনস্টাইনকে জনপ্রিয় 'হোমস্টে' বুকিং সংস্থা এয়ারবিএনবি-তে তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। একটি বিপণন এবং প্রযোজনা সংস্থার সহযোগিতায় পুরো দেশটি ভাড়া দেওয়া হত। ১৬০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের এই দেশে মাত্র ৪০০০০ জন মানুষ বাস করে। এই দেশটি ২০১১ সাল পর্যন্ত রাত্রিযাপনের জন্য ভাড়ায় পাওয়া যেত। তবে এখন আর সেই সুযোগ নেই। পরবর্তীতে সেই নিয়ম বদলে যায়। ২০১১ সালের পর থেকে দেশটি ভাড়া দেওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

তবে ২০১১ সাল পর্যন্ত ৭০ হাজার ডলারে সেই দেশ ভাড়া করতে পারতো যে কেউ, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৮৫ লাখের বেশি টাকা। দেশটি ভাড়া নেওয়া মানে শুধু ঘুরে বেড়ানো নয়। যখন কেউ দেশটি ভাড়া করতেন, তখন স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে অতিথির জন্য এলাহি আয়োজন করা হতো। সারা দেশজুড়ে উৎসব শুরু হতো। অতিথির রাস্তা চিনতে যাতে অসুবিধা না হয় সেজন্য রাস্তার ধারে বড়ো বড়ো পোস্টার লাগানো হতো। হতো এলাহি আয়োজনও। কেউ দেশটি ভাড়া করলে লিচেনস্টাইনের রাজা ব্যক্তিগতভাবে তার হাতে দেশের চাবি হস্তান্তর করতেন। যদিও এখন আর সেই সুযোগ নেই। তবুও লিচেনস্টাইন-এর এই ইতিহাস রূপকথার মতোই রোমাঞ্চকর।

সুমি আক্তার

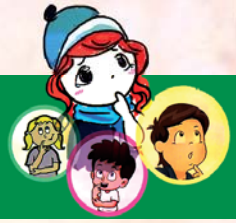

বুদ্ধিতে ধার দাও

নাদিম মজিদ

শব্দধাঁধা

পাশাপাশি: ১. ইংরেজি বর্ষপঞ্জির প্রথম মাস, ৪.কঠিন, ৫. কানের নিচের নরম মাংস, ৭. মতান্তর, ১০. মানচিত্র, ১১. যে নল দ্বারা মাটির বহু নিম্নস্তর থেকে পানি সংগ্রহ করা যায়, ১২. অখণ্ড রাশির দশভাগের একভাগ

উপর-নিচ: ১. এক প্রকার সাদা ছোটো ফল, ২. মৃদু বৃষ্টিপাতের শব্দ, ৩. সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাজধানী, ৬. গাব গাছ, ৮. চুরমার, ৯. লোম, ১০. তৎক্ষণাৎ মূল্যদান

১			২	■	৩	■	■
	■	■	৪				■
	■	■		■		■	■
৫	৬	■	৭	৮		৯	
■		■	■		■		■
১০			■	১১			
	■	■	■		■		■
১২				■	■	■	■

ব্রেইন ইকুয়েশন

সরল অঙ্কের মৌলিক নিয়মকে মেনে তৈরি করা হয়েছে ব্রেইন ইকুয়েশন। ছকটির খালি ঘরগুলো মেলানোর সময় অবশ্যই পাশাপাশি এবং উপর-নিচের অন্যান্য সমীকরণগুলোও মেলাতে হবে।

৫	*		-	৬	=	
+	■	*	■	*	■	+
	*	১	+		=	৫
-	■	+	■	-	■	-
১	*		+	৪	=	
=	■	=	■	=	■	=
	-	৫	+			৯

ছক মিলাও

শব্দ ধাঁধার মতোই এক ধরনের ধাঁধা ছক মিলাও। ছকে যে সব শব্দ বসিয়ে মেলাতে হবে, তা নিচে সংকেতের পাশে দেওয়া হলো। বোঝার সুবিধার্থে একটি ঘর পূরণ করে দেওয়া হলো।

সংকেত: কাকলিমুখর, কিসসা, বুকপোস্ট, সকল, বিহার, মুদ্রাকর, হাসি, মহাসাগর, গতর, স্টল, ঘর

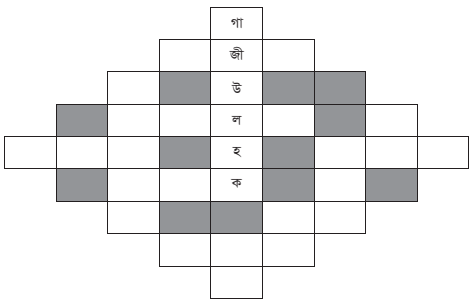

নাম্ব্রিক্স

নিচের ছকটির নাম নাম্ব্রিক্স। ১-৮১ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো থেকে ছকটিতে প্রতিটি সংখ্যা একবার করে বসাতে হবে। সংখ্যাগুলোকে ক্রমিকভাবে বসাতে হবে। বসানোর সময় পরের সংখ্যা পাশাপাশি বা উপরে-নিচে আকারে বসবে, কোনাকুনি বসানো যাবে না।

	৬৪		৬৮		৭০	৫		৩
							১	
৬১		৭৭		৮১		৭		৯
	৫৯		৭৫		৭৩		৩৩	
৫৭		৩৯				৩৫		
	৫৫		৪১	২৮			৩১	
৫৩		৫১			২২		২০	
		৫০					১৯	
৪৭			৪৪	২৫		১৭		১৫

ফেব্রুয়ারি মাসের সমাধান

শব্দধাঁধা

ব	র	ক	ত	■	আ	গু	ন
■	■	■	■	■	রে	■	ত
এ	কু	শে	প	দ	ক	■	ম
ক	■	খ	■	■	ফা	■	স্ত
গুঁ	■	র	বি	■	ল্লু	■	ক
য়ে	■	■	ব	■	ন	■	■
■	দা	■	র্জ	■	■	■	■
ত	ম	দ্দু	ন	ম	জ	লি	স

ছক মিলাও

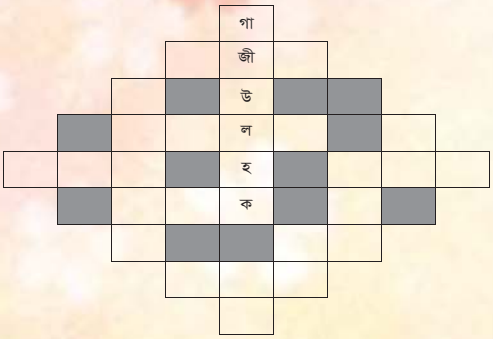

ব্রেইন ইকুয়েশন

৪	*	৩	-	৭	=	৫
*	■	*	■	*	■	*
৪	-	২	*	১	=	২
-	■	-	■	-	■	-
৯	*	১	-	৪	=	৫
=	■	=	■	=	■	=
৭	-	৫	+	৩	=	৫

নাম্ব্রিক্স

৭	৬	৫	৪	৩	৭০	৭১	৭২	৭৩
৮	২৭	২৮	২৯	২	৬৯	৮০	৭৯	৭৪
৯	২৬	৩১	৩০	১	৬৮	৮১	৭৮	৭৫
১০	২৫	৩২	৩৫	৩৬	৬৭	৬৬	৭৭	৭৬
১১	২৪	৩৩	৩৪	৩৭	৬৪	৬৫	৬০	৫৯
১২	২৩	২২	৩৯	৩৮	৬৩	৬২	৬১	৫৮
১৩	১৪	২১	৪০	৪৭	৪৮	৪৯	৫৬	৫৭
১৬	১৫	২০	৪১	৪৬	৪৫	৫০	৫৫	৫৪
১৭	১৮	১৯	৪২	৪৩	৪৪	৫১	৫২	৫৩

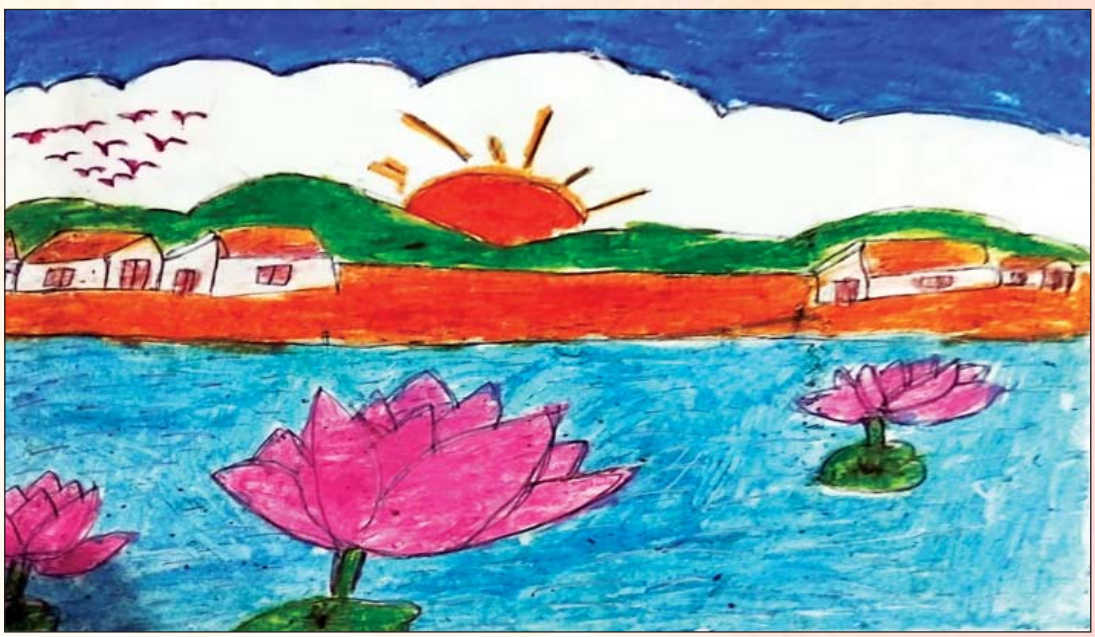

মাইমুনা বিনতে মাহফুজ, দ্বিতীয় শ্রেণি, এম.এ.খান আইডিয়াল একাডেমি, কুমিল্লা

মৌমিতা আক্তার বন্যা, সরকারি হাজী জাল মামুদ কলেজ, নকলা, শেরপুর

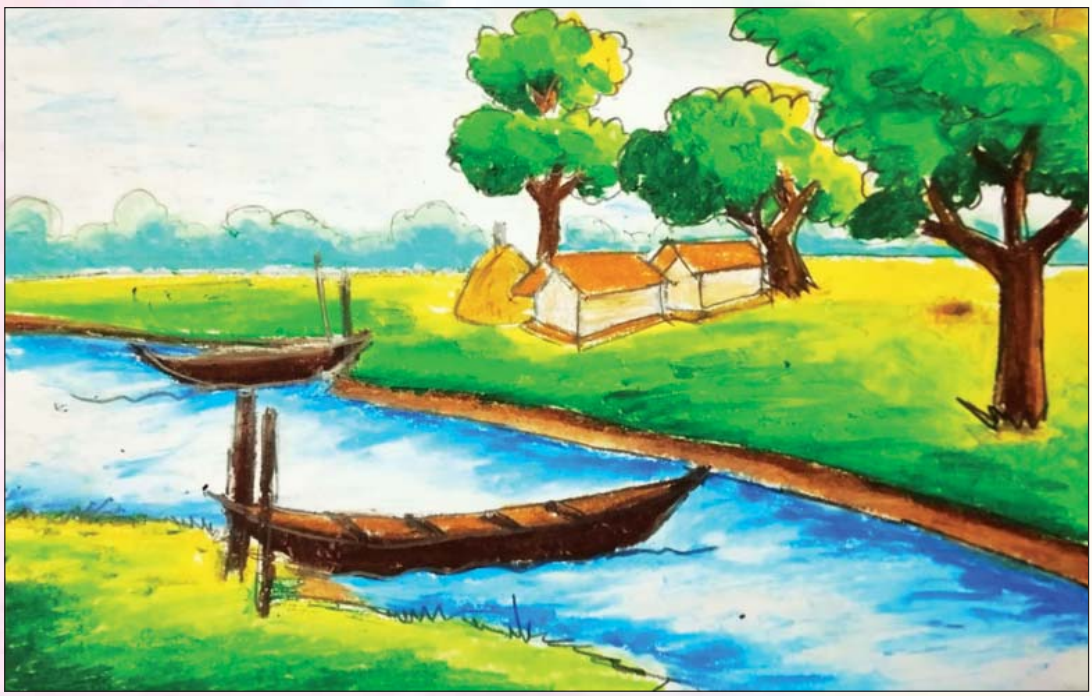

সাইয়ান খান, নবম শ্রেণি, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ ঢাকা

অন্বেষা ঘোষ, দ্বিতীয় শ্রেণি, মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

মোহাম্মদ ইয়াকুব বর্ণ, তৃতীয় শ্রেণি, জুনিয়র এইড স্কুল, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা

Regd. Dha. 143, Monthly Nobarun, Vol-49, No-07. January 2025, Tk-20.00
Memorandum No: 15.00.0000.019.05.003.16-211/2022

সেজুতি শীল, সপ্তম শ্রেণি, বাংলাদেশ মহিলা সমিতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা